من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্‌তী জেওর

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

[প্রথম ভলিউম]

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্বদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্‌ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার
শামসুল হক
৩১/৭/৮৬ হিজরী

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম খণ্ড	
কতিপয় সত্য ঘটনা	১১
আক্বীদার কথা	২০
শির্‌ক ও কুফ্‌র	২৭
বেদ্‌'আত—কুপ্রথা	২৯
কতিপয় বড় বড় গুনাহ্‌	৩০
গুনাহ্‌র কারণে পার্থিব ক্ষতি, নেক কাজে পার্থিব লাভ	৩১
ওযূর মাসায়েল	৩২
ওযূ নষ্ট হইবার কারণ	৩৭
মা'যূরের মাসায়েল	৪০
গোছলের বয়ান	৪২
ওযূ ও গোছলের পানি	৪৫
কূপের মাসআলা	৪৮
ঝুটার মাসায়েল	৫০
তায়াম্মুমের মাসায়েল	৫১
মোজার উপর মছ্‌হে	৫৭
শরমের মাসায়েল	৫৯
গোছলের মাসায়েল	৬০
বে-গোছল অবস্থার হুকুম, বে-ওযূ অবস্থার মাসায়েল	৬৪
আহ্‌কামে শরা'র শ্রেণীবিভাগ	৬৫
পানি ব্যবহারের হুকুম	৬৭
পাক-নাপাকের আরও কতিপয় মাসআলা	৬৯
এল্‌ম শিক্ষার ফযীলত	৭৩
ওযূ-গোছলের ফযীলত	৭৭
ওযূর সময় পড়িবার দো'আ	৭৮
দ্বিতীয় খণ্ড	
নাজাছাত হইতে পাক হইবার মাসায়েল	৮১
এস্তেঞ্জার মাসায়েল	৮৫
নামায	৮৮
নামাযের ওয়াক্ত	৮৯
আযান	৯৩
আযান ও এক্বামত	৯৫
আযান ও এক্বামতের সুন্নত ও মোস্তাহাব	৯৭
বিভিন্ন মাসআলা	৯৯
নামাযের আহ্‌কাম বা শর্ত	১০০
ক্বেবলার মাসায়েল	১০৮
ফরয নামায পড়িবার নিয়ম	১০৯

বিষয় পৃষ্ঠা

সজ্‌দা করিবার নিয়ম ১১০
নামাযের ফরয, নামাযের ওয়াজিব ১১৩
নামাযের কতিপয় সুন্নত ১১৭
কেরাআতের মাসায়েল ১১৮
ফরয নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল ১১৯
পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য ১২১
নামায টুটিবার কারণ ১২২
নামাযের মাক্‌রূহ এবং নিষিদ্ধ কাজ ১২৪
জমা'আতের কথা, জমা'আতের ফযীলত ও তাকীদ ১২৭
জমা'আত সম্বন্ধে ইমামগণের ফতওয়া,
জমা'আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ ১৩২
জমা'আত তরক করার ওযর ১৩৩
জমা'আতের হেকমত ও উপকারিতা ১৩৪
জমা'আত ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ,
এক্‌তেদা ছহীহ্ হওয়ার শর্ত ১৩৫
জমা'আতের বিভিন্ন মাসায়েল ১৪০
ইমাম ও মুক্তাদী সম্পর্কে মাসায়েল ১৪১
কাতারের মাসায়েল ১৪৩
জমা'আতের নামাযের অন্যান্য মাসায়েল ১৪৪
জমা'আতে শামিল হওয়া ১৪৭
যে যে কারণে নামায ফাসেদ হয় ১৪৯
আরম্ভ নামায ছাড়িয়া দেওয়া যায় ১৫১
নামাযে ওযু টুটিয়া গেলে ১৫২
বেৎর নামায ১৫৪
সুন্নত নামায ১৫৬
তাহিয়্যাতুল ওযূ, এশ্‌রাকের নামায, চাশ্‌ত নামায ১৫৭
আউয়াবীন নামায, তাহাজ্জুদ নামায, ছালাতুত্ তসবীহ ১৫৮
নফল নামাযের আহ্‌কাম ১৫৯
নামাযের ফরয, ওয়াজিব-এর মাসআলা ১৬০
নামাযের কতিপয় সুন্নত ১৬১
তাহিয়্যাতুল মসজিদ ১৬২
এস্তেখারার নামায ১৬৩
ছালাতুত্ তওবা ১৬৪
ছালাতুল হাজাত, সফরে নফল নামায,
মৃত্যুকালীন নামায ১৬৫
তারাবীহ্‌র নামায ১৬৬
কুছুফ ও খুছুফ নামায ১৬৮
এস্তেস্কার নামায, ক্বাযা নামায ১৬৯
ছহো সজ্‌দা ১৭২
তেলাওয়াতের সজ্‌দা ১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পীড়িত অবস্থায় নামায	১৮১
মুসাফিরের নামায	১৮৩
ভয়কালীন নামায	১৮৯
জুমু'আর নামায	১৯১
জুমু'আর দিনের ফযীলত	১৯২
জুমু'আর দিনের আদব	১৯৫
জুমু'আর নামাযের ফযীলত এবং তাকীদ	১৯৬
জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ	১৯৮
জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ	১৯৯
খুৎবার মাসায়েল	২০০
হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খুৎবা	২০১
হযরতের খুৎবায় কতিপয় উপদেশ	২০২
জুমু'আর নামাযের মাসায়েল	২০৪
ঈদের নামায	২০৫
ক্বাবা শরীফের ঘরে নামায	২০৮
মৃত্যুর বয়ান	২০৯
মাইয়্যেতের গোছল	২১০
কাফন	২১৩
শিশুর কাফন	২১৪
জানাযার নামায	২১৬
দাফন	২২২
শহীদের আহ্কাম	২২৭
জানাযা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মাসআলা	২২৯
মসজিদ সম্বন্ধীয় কতিপয় মাসআলা	২৩১
আরও কতিপয় বিভিন্ন মাসআলা	২৩৩
হায়েয ও এস্তেহাযা	২৩৪
হায়েযের আহ্কাম	২৩৭
এস্তেহাযার হুকুম, নেফাস	২৩৯
নেফাস ও হায়েয ইত্যাদির আহ্কাম	২৪০
নাপাক জিনিস পাক করিবার উপায়	২৪১
নামাযের বয়ান, যৌবন কাল আরম্ভ বা বালেগ হওঁয়া, নামাযের ফযীলত	২৪২

তৃতীয় খণ্ড

রোযা	২৫২
রমযান শরীফের রোযা	২৫৩
ইয়াওমুশ্‌শক (সন্দেহের দিন), চাঁদ দেখা	২৫৪
ক্বাযা রোযা	২৫৫
মান্নতের রোযা	২৫৬
নফল রোযা	২৫৭
যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় বা হয় না	২৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাফ্ফারা	২৬২
সেহ্‌রী ও ইফ্‌তার	২৬৩
যে সব কারণে রোযা রাখিয়াও ভাঙ্গা যায়, যে কারণে রোযা না রাখা জায়েয	২৬৫
ফিদ্‌ইয়া	২৬৭
এ'তেকাফ	২৬৯
এ'তেকাফ সম্বন্ধে একটি মাসআলা	২৭২
এ'তেকাফের ফযীলত, ফেৎরা	২৭৩
রোযার ফযীলত	২৭৬
ইফ্‌তারের দো'আ	২৭৯
শবে-ক্বদরের ফযীলত	২৮০
তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত	২৮১
দুই ঈদের রাতের ফযীলত, আশুরার রোযা, রজবের রোযা, শবে-বরাত	২৮২
যাকাত	২৮৩
যাকাত আদায় করিবার নিয়ম	২৮৮
জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত	২৯০
যাকাতের মাছ্‌রাফ	২৯২
কোরবানী, কোরবানী করিবার নিয়ম	২৯৫
আক্বীক্বা	৩০০
দান-খয়রাতের ফযীলত	৩০১
হজ্জ	৩০৩
মদীনা শরীফ যিয়ারত	৩০৬
নযর বা মান্নত	৩০৭
কসম খাওয়া	৩১০
কসমের কাফ্‌ফারা	৩১২
বাড়ীঘরে না যাওয়ার কসম	৩১৩
পানাহার সম্বন্ধে কসম	৩১৪
কথা না বলার কসম, ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কসম	৩১৫
রোযা-নামাযের কসম, কাপড় বিছানা ইত্যাদির কসম	৩১৬
কাফের বা মোর্‌তাদ হওয়া	৩১৭
যবাহ্	৩১৮
হালাল-হারামের বয়ান	৩১৯
নেশা পান	৩২০
সোনা বা রূপার পাত্র, পোশাক ও পর্দা	৩২১
পর্দা সম্বন্ধে আয়াত ও হাদীস	৩২৪
বিবিধ মাসায়েল	৩২৯
পতিত জিনিস পাওয়ার বয়ান	৩৩২
ওয়াক্‌ফ	৩৩৩
রাজনীতি	৩৩৪

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ)

বংশ পরিচয়ঃ

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের মুজাফ্‌ফর নগর জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর থানাভবনে ফারূকী বংশের চারিটি গোত্রের লোক বসবাস করিতেন। তন্মধ্যে খতীব গোত্রই ছিল অন্যতম। থানাভবনে সুলতান শিহাবুদ্দীন ফর্‌রূখ-শাহ্ কাবুলী ছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীর ঊর্ধ্বতন পুরুষ। থানাভবনে এই বংশে বিশিষ্ট বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেলগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং হযরত থানভীর পিতৃকুল হইল ফারূকী। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী, শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর প্রমুখ খ্যাতনামা বুযুর্গগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত মাওলানা থানভী (রঃ)-এর পিতা জনাব মুন্সি আবদুল হক ছাহেব ছিলেন একজন প্রভাবশালী বিত্তবান লোক। তিনি খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তি এবং ফার্সী ভাষায় একজন উচ্চস্তরের পণ্ডিতও ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন।

তাঁহার মাতৃকুল ছিল 'আলাভী' অর্থাৎ, হযরত আলীর বংশধর। হযরত মাওলানা থানভীর জননী ছিলেন একজন দ্বীনদার এবং আল্লাহ্‌র ওলী। উচ্চস্তরের বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেল পীরজী শ্রমদাদ আলী ছাহেব ছিলেন তাঁহার মাতুল। তাঁহার মাতামহ (নানা) মীর নজাবত আলী ছাহেব ছিলেন ফার্সী ভাষায় সুপন্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধকার। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। তিনি মাওলানা শাহ্ নেয়ায আহ্‌মদ বেরলভীর জনৈক বিশিষ্ট খলীফার মুরীদ ছিলেন। খ্যাতনামা বুযুর্গ হাফেয মোর্তজা ছাহেবের সহিতও তাঁহার আধ্যাত্মিক যোগ-সম্পর্ক ছিল বলিয়া তিনি বেলায়তের দরজায় পৌঁছেন। এমন উচ্চ মর্যাদাশীল পার্থিব ঐশ্বর্যে ধনবান, সাথে সাথে ধর্মপরায়ণতার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এমন একটি সম্ভ্রান্ত ও প্রখ্যাত বংশে হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, জামেয়ে শরীঅত, বেদ্‌আত ও রসুমাৎ এর মূল উৎপাটনকারী শাহ্ ছুফী হাজী হাফেয হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী চিশ্‌তী হানাফী জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা ছিলেন দূরদর্শী, দৃঢ়চেতা, সূক্ষ্মদর্শী, স্বাবলম্বী, সত্যপ্রিয়, খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি মানবীয় গুণে গুণান্বিত। এই মহৎ গুণাবলী তিনি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হইতে পৈতৃকসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। আর মা'রেফাত বা আধ্যাত্মিকরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করেন মাতৃকুল অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) হইতে।

জন্ম বৃত্তান্তঃ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভীর জন্ম বৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনার সহিত জড়িত। তাঁহার পিতার কোন পুত্র সন্তানই জীবিত থাকিত না। তদুপরি তিনি এক দূরারোগ্য চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকদের পরামর্শে এমন এক ঔষধ সেবন করেন যাহাতে তাঁহার প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায়। ইহাতে হাকীমুল উম্মতের মাতামহী নেহায়েত বিচলিত

হইয়া পড়েন। একদা তিনি হাফেয গোলাম মোর্তজা ছাহেব পানিপতীর খেদমতে এ বিষয়টি আরয করেন। হাফেয ছাহেব ছিলেন মজ্যূব। তিনি বলিলেনঃ "ওমর ও আলীর টানাটানিতেই পুত্র-সন্তানগুলি মারা যায়। এবার পুত্র-সন্তান জন্মিলে হযরত আলীর সোপর্দ করিয়া দিও। ইন্শাআল্লাহ্ জীবিত থাকিবে।" তাঁহার এই হেঁয়ালী কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পূর্ণ কথার সারমর্ম একমাত্র মাওলানার বুদ্ধিমতী জননীই বুঝিলেন আর তিনি বলিলেন, হাফেয ছাহেবের কথার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, ছেলেদের পিতৃকুল ফারূকী, আর আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। এযাবৎ পুত্র-সন্তানদের নাম রাখা হইতেছিল পিতার নামানুকরণে, অর্থাৎ হক্ শব্দ যোগে রাখা হইয়াছিল। যেমন আবদুল হক, ফজলে হক ইত্যাদি। এবার পুত্র-সন্তান জন্মিলে মাতৃকুল অনুযায়ী নাম রাখিতে—অর্থাৎ আমার ঊর্ধ্বতন আদিপুরুষ হযরত আলী (রাঃ)-এর নামের সহিত মিল রাখিয়া নামানুকরণ এর কথা বলিতেছেন। ইহা শুনিয়া হাফেয সাহেব সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, বাহ্বা! মেয়েটি বড়ই বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে হয়। আমার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল। ইহার গর্ভে দুইটি ছেলে হইবে। ইন্শাআল্লাহ্ উভয়ই বাঁচিয়া থাকিবে এবং ভাগ্যবান হইবে। একজনের নাম রাখিবে আশ্রাফ আলী, অপরজনের নাম রাখিবে আকবর আলী। একজন হইবে আমার অনুসারী, সে হইবে আলেম ও হাফেয। অপরজন হইবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। আল্লাহ্ পাক এক বুযুর্গের দ্বারা হযরত থানভী মাতৃ-গর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ আলমে আরওয়াহে থাকাকালীন তাঁহার নাম রাখাইয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাকের কত বড় মেহেরবানী! কত বড় সৌভাগ্যের কথা!

জন্মঃ

হিজরী ১২৮০ সনের ৫ই রবিউস্সানী বুধবার ছোব্হে ছাদেকের সময় হাকীমুল উম্মত জন্মগ্রহণ করেন। হাফেয গোলাম মোর্তজা সাহেবের নির্দেশক্রমে নবজাতের নাম রাখা হইল "আশ্রাফ আলী।" তাঁহার জন্মের ১৪ মাস পরে তাঁহার ছোট ভাই আকবর আলীর জন্ম হয়। থানাভবনের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাকে থানভী বলিয়া অবিহিত করা হয়।

বাল্যকালঃ

মাওলানার পাঁচ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পুণ্যশীলা স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করেন; সুতরাং শিশুকালেই দুই ভাই মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু পিতা জননীর ন্যায় স্নেহমমতায় উভয় শিশুর লালন-পালন ও তা'লীম তরবীয়তের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি উভয়কেই খুব স্নেহ করিতেন। স্বহস্তে গোসল করাইতেন, স্বহস্তে খাওয়াইতেন। পিতার অত্যধিক আদর যত্নের কারণে শিশুরা মায়ের বিচ্ছেদ-বেদনার কথা কখনও অনুভব করিতেই পারে নাই।

শৈশব হইতেই হযরত হাকীমুল উম্মতের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ছিল পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি কখনও বাহিরের ছেলেদের সহিত খেলাধুলা করিতেন না। ছোট ভাই আকবর আলীকে নিয়া নিজ বাড়ীর সীমার মধ্যে খেলাধুলা করিতেন। খেলাধুলার সময় ধুলাবালি গায়ে বা কাপড়ে লাগিতে দিতেন না। সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়া উভয় ভ্রাতা আনন্দ উপভোগ করিতেন। হযরত মাওলানা বাল্যকালে নেহায়েত শান্ত ও সুশীল ছিলেন। তাঁহার সু-মধুর ব্যবহারে বিধর্মীরাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিত।

সাধারণতঃ ছেলেরা মসজিদে বা উৎসব উপলক্ষে শিরনী-মিঠাই ইত্যাদি পাইবার সুযোগ গ্রহণ করে। হযরত মাওলানার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পিতা ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বরং

বাজার হইতে মিঠাই আনিয়া দুই পুত্রের হাতে দিয়া বলিতেন, মিঠাইয়ের জন্য মসজিদে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা। হযরত হাকীমুল উম্মতের মেধাশক্তিও ছিল অসাধারণ। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিনের পাঠ সহজেই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। কাজেই পিতা বা ওস্তাদগণ কেহই তাঁহাকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাইতেন না; বরং ওস্তাদগণ তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

তিনি ধর্মকর্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। এজন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিত। কেহই তাঁহার কাজের প্রতিবাদ করিত না। এমনকি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করিত না।

দেওয়ালী পূজার সময় মীরাটের ছাউনী বাজারের রাস্তার দুই ধারে সারি বাঁধিয়া অসংখ্য প্রদীপ জ্বালান হইত। তাঁহারা দুই ভাই রুমালের সাহায্যে বাতাস দিয়া একাধারে সকল প্রদীপ নিভাইয়া দিতেন। এজন্য কেহই তাঁহাদের কিছু বলিত না; এমনকি হিন্দুরাও কিছু বলিত না।

তিনি খেলার মধ্যে নামাযের অভিনয় করিতেন। সমপাঠীদের জুতাগুলিকে কেব্‌লা মুখে সারি করিয়া সাজাইতেন এবং একটি জুতা সারির সম্মুখে স্থাপন করিয়া সঙ্গীদেরকে বলিতেন, দেখ দেখ, জুতাও জামাতে নামায পড়ে। এই বলিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইহাতে বুঝা যায়, জামাতে নামায পড়ার প্রতি তাঁহার অন্তরে কত আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল। তিনি খেলাধুলায় অযথা সময় নষ্ট করিতেন না, বরং দো'আ দুরূদ পড়িতে থাকিতেন।

তাঁহার বয়স যখন ১২/১৩ বৎসর, তখন তিনি শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। গভীর রাত্রে একাকী নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহার চাচীআম্মা বলিতেন, তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সময় তোমার এখনও হয় নাই, বড় হইলে পড়িবে। ইহাতে কোন ফল হইল না; বরং তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে রহিলেন। চাচীআম্মা নিরুপায় হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল থাকাকালীন তাঁহাকে পাহারা দিতেন। কারণ, ছেলে মানুষ গভীর রাত্রে একাকি ভঁয় পাইতে পারে।

ছোটবেলা হইতেই তিনি ওয়ায বা বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সময় সময় সওদা আনিবার জন্য তাঁহাকে বাজারে যাইতে হইত। পথিমধ্যে কোন মসজিদ দেখিতে পাইলে উহাতে ঢুকিয়া পড়িতেন এবং মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবার ন্যায় কিছু পড়িতেন, অথবা কিছু ওয়ায নছীহত করিতেন। এরূপে তিনি ছোট বেলায়ই ওয়াযের ক্ষমতা অর্জন করিতে সক্ষম হন। ফলে তিনি উত্তরকালে বিখ্যাত ওয়ায়েয বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত যখন সবেমাত্র মক্তবের ছাত্র তখন কুত্‌বুল আকতাব হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ছাহেবের খাছ খলীফা হযরত শায়খ মুহাম্মদ মুহাদ্দেস (ইনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর পীর-ভাই) বলিতেন, এই বালক উত্তরকালে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে। হযরত হাকীমুল উম্মত বাল্যকালে যখন গৃহের বাহিরে যাইতেন, তখন আকাশের মেঘমালা তাঁহাকে ছায়া দিত। আল্লাহ্‌র ওলী এবং যথার্থ অর্থে "নায়েবে রসূল" হওয়ার ইহাই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

একটি স্বপ্ন ঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত বাল্যকালে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে আমি দেখিলাম, আমি মীরাটের যে বাড়ীতে থাকিতাম উহাতে উঠিবার দুইটি সিঁড়ি ছিল, একটি বড় ও একটি ছোট। "আমি দেখিলাম, বড় সিঁড়িটির একটি পিঞ্জিরায় দুইটি সুন্দর কবুতর। অতঃপর যেন চারি দিক সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাইয়া গেল। তখন কবুতর দুইটি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ আমাদের পিঞ্জিরাটিকে আলোকিত করিয়া দিন। উত্তরে আমি বলিলাম, তোমরা নিজেরাই

আলোকিত করিয়া লও। তখন কবুতরদ্বয় নিজেদের ঠোঁট পিঞ্জিরার সহিত ঘর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খাঁচাটি এক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া গেল।"

কিছুদিন পর এই স্বপ্নের কথা তিনি তাঁহার মামা ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি ইহার তা'বীর এই করিলেন যে, কবুতর দুইটির একটি হইল 'রূহ' অপরটি 'নফ্স'। মোজাহাদা বা সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে তাহাদিগকে নূরানী করিতে আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু তোমার কথায় তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে নূরানী করিয়া লইল। ইহাতে বুঝা যায়—রিয়াযত ও মোজাহাদা ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ পাক তোমার রূহ্ ও নফ্সকে উজ্জ্বল করিয়া দিবেন। কালে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশব হইতেই তিনি ছিলেন নাযুক তবিয়তের। তিনি কাহারো নগ্ন পেট দেখিতে পারিতেন না। অনাবৃত পেট দেখামাত্র তাঁহার বমি হইয়া যাইত। যে গৃহে কোন প্রকার তীব্র সুগন্ধ থাকিত তথায় তিনি ঘুমাইতে পারিতেন না আর দুর্গন্ধের তো কোন কথাই নাই। কোন জিনিস এলোমেলো দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা ব্যাথা আরম্ভ হইয়া যাইত।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

হযরত মাওলানা থানভী (রঃ) কোরআন মজীদ ও প্রাথমিক উর্দু, ফার্সী কিতাব মীরাটে শিক্ষা লাভ করেন। পরে থানাভবন আসিয়া তদীয় মাতুল ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর আরবীতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ১২৯৫ হিজরীতে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান "দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসায়" গমন করেন। মাত্র পাঁচ বৎসরেই দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে এল্‌মে হাদীস, এল্‌মে তফ্সীর, আরবী সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র, সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র, সৌরবিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, ইসলামী আইন শাস্ত্র, নৈতিকচরিত্রবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান, মূলনীতি শাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞান, ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বাইশটি বিষয়ের জটিল কিতাবসমূহ অতি কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি "জের ও বম" নামে একটি মূল্যবান ফার্সী কাব্য রচনা করেন।

দেওবন্দে দুইটি স্বপ্ন ঃ

১। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, 'একটি কূপ হইতে রৌপ্য স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে ধাবিত হইতেছে'।

২। আর একবার তিনি দেখেন জনৈক বুযুর্গ ও কোন এক দেশের গভর্ণর, এই দুই ব্যক্তি তাঁহাকে দুইখানা পত্র লেখেন। উভয় পত্রেই লেখা ছিল যে, আমরা আপনাকে মর্যাদা প্রদান করিলাম।" ঐ পত্রের একটিতে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর নামের মোহর অঙ্কিত ছিল। উহার লেখাগুলি বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর ছিল। অপর পত্রের মোহরের ছাপ অস্পষ্ট থাকায় পড়া যাইতেছিল না। হযরত মাওলানা এই উভয় স্বপ্ন দেওবন্দের প্রধান অধ্যক্ষ ও পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবের নিকট ব্যক্ত করেন। প্রথম স্বপ্নের তা'বীরে মাওলানা বলিলেন, দুনিয়ার ধন-দৌলত তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে, অথচ তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলিলেনঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ দ্বীন ও দুনিয়ায় তোমার যথেষ্ট মান-সম্মান হইবে। এ সময় উক্ত ওস্তাদ ছাহেব তাঁহার দ্বারা ফত্ওয়া লিখাইতেন। ওস্তাদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি ওস্তাদের যথেষ্ট খেদমত করিতেন। ফলে তিনি ছাত্র

জীবনে "আশ্‌রাফুত্তালাবা" এবং কর্ম-জীবনে "আশ্‌রাফুল ওলামা" নামে খ্যাতি লাভ করেন। যেমনটি নাম তেমনি কাম।

দারুল উলুমের অধ্যয়ন শেষে কৃতী ছাত্রদের যথারীতি পাগড়ী পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর কুত্‌বে আ'লম হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী ছাহেব (রঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তে হযরত মাওলানা থানভীর মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিলেন। এ সময় মাদ্রাসার ওস্তাদদের নিকট তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা শুনিয়া হযরত গঙ্গোহী ছাহেব তাঁহাকে কতিপয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। হযরত মাওলানা ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। এই প্রকার দুর্বোধ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর শুনিয়া হযরত গঙ্গোহী ছাহেব মুগ্ধ হন এবং তাঁহার জন্য দো'আ করেন। ফলে তিনি শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন জগৎবরেণ্য আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়েন।

অধ্যাপনা ঃ

পাঠ্য জীবন শেষে ১৩০১ হিজরীতে কানপুর ফয়েযে 'আম মাদ্রাসায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। হাদীস, তফ্‌সীর ও উচ্চস্তরের কিতাবসমূহ কৃতিত্বের সহিত পড়াইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ায নছীহতের মাধ্যমেও জনগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। এদিকে মধুর কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর সম্বোধন, মার্জিত ভাষা ও অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গী, অপর দিকে কোরআন হাদীসের সরল ব্যাখ্যা, মা'রেফাত ও তাছাউফের সূক্ষ্ম বিষয়ের সহজ সমাধান; মোটকথা, ওয়াযের মাহ্‌ফিলে অফুরন্ত ভান্ডার হইতে অভাবনীয় মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য বিকশিত হইতে থাকিত। ফলে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইত। তাঁহার ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।

জনসমাজে হযরত মাওলানার জনপ্রিয়তা দেখিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের মধ্যে আর্থিক স্বার্থ লাভের বাসনা জাগরিত হয়। তাঁহারা তাঁহার ওয়ায মাহ্‌ফিলে মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায় করার কথা হযরত মাওলানার নিকট ব্যক্ত করিলেন। হযরত মাওলানা এই উপায়ে চাঁদা সংগ্রহ করা এল্‌মী মর্যাদার খেলাফ ও না-জায়েয মনে করিতেন। তাই তিনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আবেদন রক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষের মধ্যে পরস্পর নানাপ্রকার কানাঘুষা আরম্ভ হইল। এ কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি মাদ্রাসার কার্যে ইস্তিফা দেন এবং সরাসরি বাড়ী চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। এল্‌মে দ্বীন ও দর্শন শাস্ত্রে এমন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুর্লভ ভাবিয়া জনাব আবদুর রহ্‌মান খান ও জনাব কেফায়াত উল্লাহ্‌ সাহেবদ্বয় মাসিক ২৫টাকা বেতনে টপকাপুরে অপর একটি মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এল্‌মে দ্বীনের খাতিরে হযরত মাওলানা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন। টপকাপুর জামে মসজিদের নামানুসারে মাদ্রাসার নাম রাখিলেন জামেউল উলুম। আজও কানপুরে এই মাদ্রাসা বিদ্যমান আছে এবং তাঁহার স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

তিনি একাধারে চৌদ্দ বৎসর জামেউল উলুমে এল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদানে মশ্‌গুল থাকেন। অতঃপর ১৩১৫ হিজরীর ছফর মাসে স্বীয় মুর্শিদ শায়লুল আরব ও আ'জম কুত্‌বে আ'লম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌ মোহাজেরে মক্কী ছাহেবের অনুমতিক্রমে কানপুরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া থানাভবনে আসিয়া উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

বুযুর্গগণের খেদমতে মাওলানা থানভী ঃ

আল্লাহ্‌র ওলীগণের প্রতি হযরত হাকীমুল উম্মতের ভক্তি ও মহব্বত ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি বলিতেন, আল্লাহ্‌র ওলীদের নামের বরকতে রূহ সজীব এবং অন্তরে নূর পয়দা হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, তরীকতের পথে আমি রিয়াযত ও মোজাহাদা করি নাই। আল্লাহ্ পাক যাহাকিছু দান করিয়াছেন সমস্তই শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও বুযুর্গানে দ্বীনের আন্তরিক দো'আ ও তাওয়াজ্জুর বরকতে পাইয়াছি।

যে মজযুব হাফেয গোলাম মোর্‌তাজার দো'আয় হযরত মাওলানার ইহজগতে আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার নামকরণ, "আশ্‌রাফ আলী" করেন, তিনি হযরত মাওলানাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার অন্তরে খোদাপ্রেম বদ্ধমূল হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ বটে।

যখন দেওবন্দে হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী কুদ্দিসা সির্‌রুহু ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার পবিত্র নূরানী চেহারা দর্শনমাত্র তাঁহার হাতে বায়'আত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হযরত মাওলানা থানভীর অন্তরে জাগরিত হয়; কিন্তু ছাত্র জীবনে মুরীদ হওয়া সমীচীন নহে বলিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ১২৯৯ হিজরীতে হজরত মাওলানা গঙ্গোহী ছাহেব (রঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমনকালে মাওলানা থানভী কুত্‌বুল আক্‌তাব হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী ছাহেবের খেদমতে পত্রযোগে আবেদন করিলেন, তাঁহাকে বায়'আত করিবার জন্য যেন গঙ্গোহী ছাহেবকে বলিয়া দেন। যথাসময় পত্রের উত্তর আসিল। পত্রে লিখা ছিল—হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) স্বয়ং তাঁহাকে মুরীদ করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর।

হযরত হাজী ছাহেব যখন মক্কায় হিজরত করেন, তখন হযরত থানভী (রঃ) ভূমিষ্ঠই হন নাই। অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেলে স্থানকালের যাবতীয় পর্দা অপসারিত হইয়া যায়। আ'রেফ বিল্লাহ্ হযরত হাজী ছাহেব পবিত্র মক্কায় থাকিয়াই থানাভবনের এই মহামণিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি হযরত মাওলানার পাঠ্যজীবনে তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন, যখন তুমি হজ্জ করিতে আসিবে, তখন তোমার বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়া আসিও।

১৩০১ হিজরী শাওয়াল মাস। হাকীমুল উম্মত কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার পিতা পবিত্র হজ্জ ক্রিয়া পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্নেহের পুত্র হাকীমুল উম্মতও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। যথাসময়ে পিতা-পুত্র পবিত্র মক্কাভূমিতে হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে উপনীত হইলেন; ইহাই হইল তাঁহার সহিত হযরত মাওলানার প্রথম সাক্ষাৎকার। হাজী সাহেব হযরত মাওলানার দর্শন লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং হাতে হাতে তাঁহার বায়'আত করিলেন। তখন তাঁহার পিতাকেও বায়'আত করিলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে এক মুর্শিদের হাতে বায়'আত হইলেন। হজ্জের পর হযরত হাজী ছাহেব, হাকীমুল উম্মতকে ছয় মাস তাঁহার খেদমতে অবস্থান করিতে বলিলেন; কিন্তু পিতার মন স্নেহের পুত্রকে একা দূরদেশে রাখিয়া যাইতে চাহিল না। অগত্যা হযরত হাজী ছাহেব বলিলেন, পিতার তাবেদারী অগ্রগণ্য, এখন যাও, আগামীতে দেখা যাইবে।

হজ্জ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কানপুরে অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, তবলীগ, ফত্‌ওয়া প্রদান ইত্যাদি কার্যে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এদিকে মুর্শিদের সহিত পত্র বিনিময় হইতে লাগিল। তিনি প্রায় সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৩০৭ হিজরী হইতে হযরত মাওলানার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সংস্রব অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল। হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে মাদ্রাসার সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। উত্তর আসিল, আল্লাহ্‌র বন্দাদেরকে দ্বীনের ফয়েয পৌঁছান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। শ্রদ্ধেয় মুর্শিদের পরামর্শ শিরোধার্য। তাই এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা প্রদানের কাজ চালু রাখিলেন। এইভাবে তিনটি বৎসর অতীত হওয়ার পর হিজরী ১৩১০ সালে হযরত মাওলানার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও মনকে আর প্রবোধ দিতে পারিলেন না। আর মুর্শিদ বলিয়াছিলেন, "মিয়া আশ্‌রাফ আলী, ছয় মাস আমার নিকট থাক"। মুর্শিদের সেই আহ্বান তৎক্ষণাৎ হযরত মাওলানার অন্তরে দাগ কাটিয়া গিয়াছিল। ঐ একই কথা বার বার তাঁহার অন্তরে তোলপাড় করিতে লাগিল। কি অদৈম্য আকর্ষণ! অবশেষে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর মক্কা শরীফে গমনের অনুমতিপত্র আসিল। স্নেহের মুরীদ প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের খেদমতে পৌঁছিয়া স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং মুর্শিদের পদতলে নিজের সত্ত্বা বিলীন করিয়া দিলেন। মুর্শিদও আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই পীর ও মুরীদ একই রং ধারণ করিলেন। হযরত হাজী ছাহেব নিঃসংকোচে ফরমাইতেন, মিয়া আশরাফ! তুমি তো সম্পূর্ণ আমার তরীকার উপর। হযরত মাওলানার কোন লিখা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে বলিতেন, আরে তুমি তো আমারই মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছ।

হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে মা'রেফত সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জানিতে চহিলে তিনি হযরত মাওলানার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন, একে জিজ্ঞাসা কর, সে ইহা ভালরূপে বুঝিয়াছে। ইহার কারণ, মুর্শিদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুরীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়াছে। ছয় মাসের মাত্র এক সপ্তাহ বাকী থাকিতে হযরত মাওলানা হাজী সাহেবের খেদমত হইতে বিদায়ের অনুমতি চাহিলেন তখন হযরত হাজী ছাহেব তাঁহাকে খাছ করিয়া দুইটি অছিয়ত করিলেন ১। মিয়া আশ্‌রাফ আলী! হিন্দুস্তানে গিয়া তুমি একটি বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইবে, তখন ত্বরা করিও না। ২। কানপুর হইতে মন উঠিয়া গেলে অন্য কোথাও সম্পর্ক স্থাপন করিও না; আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া থানাভবনেই অবস্থান করিও। হিজরী ১৩১১ সনে প্রিয় জন্মভূমি থানাভবনের আহ্বান হযরত মাওলানাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। অবশেষে শ্রদ্ধেয় মুর্শিদের ওছিয়ত ও আধ্যাত্মিক সম্পদসহ থানাভবনে আসিয়া হাযির হইলেন।

হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লা হযরত মাওলানাকে এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, কেহ মাওলানার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে নাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। অত্যধিক স্নেহবশতঃ তিনি তাঁহাকে 'মিয়া আশ্‌রাফ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একবার মুর্শিদে আ'লা প্রিয়তম শিষ্যকে স্বীয় খাছ কুতুবখানা দিতে চাহিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা আরয করিলেন, এই সব কিতাব তো আধ্যাত্মিকতার খোলস মাত্র, অনুগ্রহ করিয়া ইহার পরিবর্তে আমার সীনায় কিছু দান করুন। প্রিয়তম শিষ্যের এমন গভীর তত্ত্বপূর্ণ আব্‌দার শুনিয়া মুর্শিদ বলিলেন, হাঁ, সত্য বটে, কিতাবে আর কী আছে? সবই তো সীনায় রহিয়াছে। মুর্শিদের আন্তরিক দো'আয় মাওলানার অন্তঃকরণ এল্‌মে মা'রেফাতে ভরপুর হইয়া গেল। বিদায় গ্রহণকালে হযরত হাজী ছাহেব মুরাক্কাবা করিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! ইহার সম্মান কাসেম ও রশীদকে অতিক্রম করিয়া গেল। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

মুর্শিদের খেদমত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হযরত মাওলানা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। হযরত হাজী ছাহেব হাজীদের মারফৎ বলিতেন, "আমার মিহিন মৌলভীকে সালাম বলিও।" এই মিহিন শব্দে হযরত মাওলানার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারূপ গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পীর ও মুরীদের কী অপূর্ব সম্পর্ক, কী মায়া, কী ভক্তি!

হযরত মাওলানা দেশে ফিরিবার সময় কানপুরে বখ্‌শী নযীর হাসান ছাহেব স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত মাওলানা জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছেন, আর সারা হিন্দুস্তান তাঁহার দেহের নূরে নূরানী হইয়া উঠিয়াছে। কালে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল।

দেশে আসিয়া পুনরায় তিনি জামেউল উলুমে অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মা'রেফাতের আলো বিচ্ছুরিত হইল। এক কথায় মাদ্রাসা যিক্‌র-আয্‌কারের খানকায় পরিণত হইল। বহু অমুসলিমও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। চৌদ্দ বৎসর অধ্যাপনার পর হিজরী ১৩১৫ সালে কানপুর হইতে থানাভবনে আসিয়া খানকায়ে এমদাদিয়ার আবাদে মশ্‌গূল হইলেন। হযরত মাওলানার থানাভবনে আগমনের সংবাদে হযরত হাজী ছাহেব নেহায়ত খুশী হইয়া লিখিলেনঃ 'আপনার থানাভবন যাওয়া অতি উত্তম হইয়াছে। আশা করি, আপনার দ্বারা বহু লোকের যাহেরী-বাতেনী উপকার হইবে এবং আপনি আমাদের মাদ্রাসা ও মসজিদ পুনঃ আবাদ করিবেন। আপনার জন্য দো'আ করিতেছি।' —মকতুবাত

তিনি পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় থানাভবনে আসিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিরাট কর্ম সম্পাদন করাইলেন। পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে বহু আলেম-ওলামা, অর্ধ শিক্ষিত; সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার দরবার হইতে ফয়েয হাসেল করিবার জন্য সমবেত হইত এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তাহা লাভ করিত। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীর ফয়েয ও বরকত ছিল বিভিন্নমুখী ও সুদূরপ্রসারী। সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তাহা প্রকাশ করা সুদুরপরাহত। তাঁহার মধ্যে যে সব গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, তাহা কয়েকজনে মিলিতভাবে অর্জন করাও সম্ভব নহে। তিনি একাধারে ছিলেন কোরআন পাকের অনুবাদক ও কোরআনের ব্যাখ্যাকার, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, এবং একজন লেখক। তিনি প্রায় এক সহস্র কিতাব রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক কিতাব বহু ভলিউমবিশিষ্ট তাঁহার রচিত প্রায় কিতাবই তাছাওউফে ভরপুর। তফসীরকার হিসাবে তিনি জগৎবিখ্যাত। তাঁহার কৃত তফসীর "তফ্‌সীরে বয়ানুল কোরআন" অদ্বিতীয়। ওয়ায়েয হিসাবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁহার তথ্যপূর্ণ বিভিন্নমুখী ওয়াযসমূহ ওয়াযের সময় সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইত এবং পত্র-পত্রিকায়ও মুদ্রিত হইত। পরে এইগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী ও ওয়াযসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত কোন কিতাবের স্বত্ব সংরক্ষিত নহে। যে কেহ ছাপিতে পারে। কী অপূর্ব স্বার্থ ত্যাগ! বাংলা ভাষায়ও তাঁহার রচিত অসংখ্য কিতাব মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। এল্‌মে দ্বীনের ওস্তাদ হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অসংখ্য আলেমে হক্কানী তাঁহার হাতে গড়া। এতদ্ভিন্ন তিনি ছিলেন হক্কানী পীর ও মুর্শিদে কামেল।

তাছাওউফের দিক দিয়া তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে মিল্লাত বা যুগপ্রবর্তক। এক কথায় তিনি ছিলেন মুজতাহিদ—যুগসংস্কারক। অনেক ছুফী, পীর এল্‌মে তাছাওউফকে বিকৃত করিয়া

তুলিয়াছিল। তিনি এই বিকৃত তাছাওউফকে ত্রুটিযুক্ত বশতঃ জগৎবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহারই সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ও চিকিৎসা দ্বারা তাছাওউফের ভ্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বহু যোগ্য মুরীদকে খেরকায়ে খেলাফত দান করিয়াছেন। তাঁহার খলীফাগণের লক্ষ লক্ষ মুরীদ শুধু পাক-ভারতেই নহে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। (হায়াতে আশ্‌রাফ, সীরাতে আশ্‌রাফ দ্রঃ)

চির বিদায়ঃ

১৯শে জুলাই ১৯৪৩ ইং সোমবার দিবাগত রাত্রে এশার নামাযের পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল বিরাশী বৎসর তিন মাস এগার দিন। এন্তেকালের দুই দিন পূর্বে পাঞ্জাবের এক মসজিদের ঈমাম (সৈয়দ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরীর শাগরিদ) স্বপ্নে দেখেন, আকাশপ্রান্তে ধীরে ধীরে লিখা হইতেছে ○ قد كسر جناح الاسلام (ইসলামের বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।)

কারামতঃ

১। এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মতের জন্য আখের গুড় হাদিয়া স্বরূপ আনিল, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। পরে জানা গেল যে, ঐ গুড় ছিল যাকাতের।

২। কেহ হযরত হাকীমুল উম্মতের খেদমতে এছলাহের জন্য আসিলে তিনি তাহার গোপন রোগ ধরিতে পারিতেন এবং ঐ হিসাবে তাহার এছলাহ করিতেন। তাঁহার নিকট কোন রোগ গোপন রাখার উপায় ছিল না।

৩। তাঁহার কোন ভক্ত রোগারোগ্যের জন্য দো'আ চাহিয়া পত্র লিখিলে লেখার সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় হইয়া যাইত।

৪। তাঁহার জনৈক খলীফা বলেন, একদা আলীগড়ের শিল্প-প্রদর্শনীতে দোকান খুলিয়াছিলাম। মাগরিবের পর প্রদর্শনীর কোন এক ষ্টলে আগুন লাগে। আমি একাকী আমার মালপত্র সরাইতে সক্ষম হইতেছিলাম না। আকস্মাৎ দেখিলাম, হযরত হাকীমুল উম্মত আমার কাজে সাহায্য করিতেছেন। তাই আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। পরে জানিলাম, হযরত তখন থানাভবনেই অবস্থান করিতেছিলেন।

৫। একবার তিনি লায়ালপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার চাকরকে ষ্টেশনের বাতি জ্বালাইয়া হযরতের কামরায় দিতে আদেশ করিলেন। হযরত আল্লাহ্ পাকের দরবারে পরের হক নষ্ট করা হইতে বাঁচিবার দো'আ করিলেন। মাষ্টারের মন মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি চাকরকে তাহার নিজস্ব বাতি জ্বালাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

৬। কানপুরে কলিমুল্লাহ্ নামে এক ব্যক্তির হামেশা অসুখ লাগিয়া থাকিত। আরবী 'কিল্‌ম' (অর্থ জখম) হইতে এই কলিমুল্লাহ্ নামের উৎপত্তি বলিয়া হযরত তাঁহার নাম রাখিয়া দিলেন ছলিমুল্লাহ্। অতঃপর ঐব্যক্তির কোন অসুখ হইত না।

৭। একবার হযরত থানভী (রঃ) কানপুরে বাশমণ্ডীতে ওয়ায করিতেছিলেন। হঠাৎ ঝড় আসিল। হযরত তাঁহার শাহাদাত অঙ্গুলীতে ফুক দিয়া ঘুরাইলেন। তৎক্ষণাৎ ঝড়ের মোড় ঘুরিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। ওয়াযের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল।

৮। মাওলানা হাকীম আবদুল হক বলেন, যে-ব্যক্তি হযরতের দরবারে খাঁটি নিয়তে বসিত তাহার দিল আপনা হইতে পরিষ্কার হইয়া যাইত এবং দ্রুত আখেরাতের দিকে মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

একটি স্বপ্ন ঃ

৯। একবার হযরত মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওসমানী সাহেব স্বপ্নে দেখিলেন, মদীনা শরীফের এক বুযুর্গ তফ্‌সীরে বয়ানুল কোরআনের তা'রীফ করিতে করিতে বলিলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার বলিতেছেন, অমুক আয়াতের তফ্‌সীর বয়ানুল কোরআনে এইভাবে লিখা আছে। হযরত ওসমানী সাহেব বলেন, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমি হযরত (দঃ)-এর এই উক্তি নিজ কানে শুনিয়াছি। স্বপ্নে আমার ইহাও অনুভূত হইল যে, নবী করীমের দরবারে "বয়ানুল কোরআন" এরূপ মকবুল হওয়ার কারণ, হযরত মাওলানার পরিপূর্ণ এখলাছ।

—০—

বেহেশ্‌তী জেওর

প্রথম খণ্ড

কতিপয় সত্য ঘটনা

১ দানের সুফল

হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'একদা এক ব্যক্তি কোন এক গভীর জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছিল। হঠাৎ সে এক মেঘখণ্ড হইতে এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইল, অমুকের বাগিচায় পানি দাও। এই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড মেঘ বাগিচার উপর আসিয়া পৌঁছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বাগান প্লাবিত হইয়া গেল। পানির স্রোত একটি নালা দিয়া বহিয়া চলিল। ঐ লোকটি পানির স্রোত অনুসরণ করিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, একটি লোক কোদাল দ্বারা ক্ষেতের আইল বাঁধিয়া ঐ পানি তাহার বাগিচায় আটকাইতেছে। লোকটি বাগিচাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই আপনার নাম কি? বাগিচাওয়ালা সেই নামই বলিল—যাহা সে মেঘের মধ্য হইতে শুনিয়াছিল। অতঃপর বাগিচাওয়ালা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই! আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?' লোকটি বলিল, যে মেঘের এই পানি উহার মধ্য হইতে একটি আওয়াজ শুনিয়াছি, আপনার নাম লইয়া বলিয়াছেঃ 'অমুকের বাগিচায় পানি দাও।' আচ্ছা, আপনি বলুন তো, আপনি কি আমল করেন? আপনি কি করিয়া আল্লাহ্‌র এত পেয়ারা হইলেন? বাগিচাওয়ালা বলিল, 'ইহা তো বলার কথা নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজ বলা ভাল নহে। শুধু আপনার অনুরোধ রক্ষার্থে বলিতেছি—এই বাগিচায় যাহাকিছু ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করি, এক ভাগ নিজের বাল-বাচ্চাসহ ভোগ করি, আর এক ভাগ বাগিচার উন্নতিকল্পে ব্যয় করি।

উপদেশঃ আল্লাহ্ পাকের কী রহ্‌মত! যে খাঁটীভাবে আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী করে, তাহার যাবতীয় কার্য আল্লাহ্ গায়েব হইতে সাহায্য করিয়া এমন সুন্দররূপে সমাধা করিয়া দেন যে, সে জানিতেও পারে না। উপরোক্ত ঘটনাটি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সত্যই বলা হইয়াছে যে, যে আল্লাহ্‌র হয় আল্লাহ্‌ও তাহার হইয়া যান।

২ না-শোক্‌রীর পরিণাম

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী ইস্‌রায়ীল গোত্রে তিনজন লোক ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। তন্মধ্যে একজন ছিল কুষ্ঠ

রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয় জন মাথায় টাক পড়া, তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা এই তিনজনকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাইলেন। ফেরেশ্‌তা প্রথমে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোকটির নিকট গিয়া বলিলেন, তুমি কি চাও? লোকটি উত্তর করিলঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই চাই যে, আমার এই কুৎসিত ব্যাধি নিরাময় হউক, আমার দেহের চর্ম নূতন রূপ ধারণ করিয়া সুন্দর হউক—যেন আমি লোক সমাজে যাইতে পারি, লোকে আমাকে ঘৃণা না করে। আমি যেন এই বালা হইতে মুক্তি পাই। ফেরেশ্‌তা তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া দো'আ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাহার রোগ নিরাময় হইয়া গেল। সর্বশরীর নূতন রূপ ধারণ করিল। তারপর আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পাইতে চাও? লোকটি বলিল, আমি উট পাইলে সন্তুষ্ট হই। ফেরেশ্‌তা তাহাকে একটি গর্ভবতী উট্‌নী আনিয়া দিলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে বরকতের জন্য দো'আ করিলেন।

অতঃপর ফেরেশ্‌তা টাকপড়া লোকটির নিকট গিয়া বলিলেন, তুমি কোন্ জিনিস পছন্দ কর? লোকটি বলিল, আমার মাথার ব্যাধি নিরাময় হউক, যে কারণে লোক আমাকে ঘৃণা করে। আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ভাল হইয়া গেল। নূতন চুল গজাইয়া নূতন রূপ ধারণ করিল। এখন ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ প্রকারের মাল তুমি পাইতে চাও? সে বলিল, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি গরু দান করেন, তবে আমি খুব সন্তুষ্ট হই। ফেরেশ্‌তা একটি গর্ভবতী গাভী আনিয়া দিলেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করিলেন।

অনন্তর ফেরেশ্‌তা অন্ধ লোকটির নিকট গমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? লোকটি বলিলঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখ দুইটির দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিন, যেন আমি আল্লাহ্‌র দুনিয়া দেখিতে পাই। ইহাই আমার আরজু। আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশ্‌তা তাহার চোখের উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ ভাল হইয়া গেল। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। অতঃপর ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল তো, কোন্ চিজ তুমি পছন্দ কর? অন্ধ বলিল, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি বকরী দান করেন, আমি খুব খুশী হইব। ফেরেশ্‌তা তৎক্ষণাৎ একটি গাভীন বকরী আনিয়া তাহাকে দিলেন এবং বরকতের দো'আ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই এই তিন জনের উট, গরু এবং বকরীতে মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বিরাট ধনী। অনতিকাল পরে সেই ফেরেশ্‌তা প্রথম ছুরতে পুনরায় সেই উটওয়ালার (কুষ্ঠ রোগীর) নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি বিদেশে (ছফরে) অসিয়া বড়ই অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার বাহক জন্তুটিও মারা গিয়াছে। আমার পথ-খরচও ফুরাইয়া গিয়াছে। আপনি যদি মেহেরবানী করিয়া কিছু সাহায্য না করেন, তবে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। এক আল্লাহ্ ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। যে আল্লাহ্ আপনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুশ্রী চেহারা দান করিয়াছেন তাঁহার নামে আমি আপনার নিকট একটি উট প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে একটি উট দান করুন। আমি উহাতে আরোহণ করিয়া কোন প্রকারে বাড়ী যাইতে পারিব। লোকটি বলিল, হতভাগা কোথাকার! এখান হইতে দূর হও, আমার নিজেরই কত প্রয়োজন রহিয়াছে? তোমাকে দিবার মত কিছুই নাই। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, আমি তোমাকে চিনি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলে না? লোকে কি এই রোগের কারণে তোমাকে তুচ্ছ ও ঘৃণা করিত না? তুমি কি গরীব ও নিঃস্ব ছিলে না? তৎপর আল্লাহ্ পাক কি তোমাকে এই

ধন-সম্পদ দান করেন নাই? লোকটি বলিল, বাঃ বাঃ! কি মজার কথা বলিতেছ? আমরা বাপ-দাদার কাল হইতেই বড় লোক। এই সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে আমরা ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সেইরূপ করিয়া দিন যেরূপ তুমি পূর্বে ছিলে। কিছুকালের মধ্যে লোকটি সর্বস্বান্ত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ফেরেশ্‌তা দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ, টাকপড়া লোকটির নিকট গমন করিলেন। লোকটির এমন সুন্দর ও সুঠাম চেহারা! মাথায় কুচকুচে কাল চুল, যেন তাহার কোন রোগই ছিল না। ফেরেশ্‌তা তাহার নিকট একটি গাভী চাহিলেন। কিন্তু সেও উটওয়ালার ন্যায়ই "না" সূচক শব্দে জবাব দিল। ফেরেশ্‌তাও তাহাকে বদদো'আ দিয়া বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যুক হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমার সেই পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া দেন। ফেরেশ্‌তার দো'আ ব্যর্থ হইবার নহে। তাহার মাথায় টাক পড়া শুরু হইল, সমস্ত ধন-সম্পদ লয় পাইল।

তারপর ফেরেশ্‌তা পূর্বাকৃতিতে সেই অন্ধ ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া বলিলেন, বাবা আমি মুসাফির! বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার টাকা-পয়সা কিছুই নাই। আপনি সহানুভূতি ও সাহায্য না করিলে আমার কোন উপায় দেখিতেছি না। যে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এক বিরাট সম্পত্তির মালিক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নামে আমাকে একটি বকরী দান করুন—যেন কোন প্রকারে অভাব পূরণ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি। লোকটি বলিল, নিশ্চয়ই। আমি অন্ধ, দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলাম। আমি আমার অতীতের কথা মোটেই ভুলি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু নিজ রহ্‌মতে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই সব ধন-সম্পদ যাহাকিছু দেখিতেছেন সবই আল্লাহ্ তা'আলার, আমার কিছুই নহে। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দান করিয়াছেন। আপনার যে কয়টির প্রয়োজন আপনার ইচ্ছামত আপনি লইয়া যান। যদি ইচ্ছা হয় আমার পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির জন্য কিছু রাখিয়াও যাইতে পারেন। আল্লাহ্‌র কছম, আপনি সবগুলি লইয়া গেলেও আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইব না। কারণ, এসব আল্লাহ্‌র দান।

ফেরেশ্‌তা বলিলেন, বাবা, এসব তোমার থাকুক। আমার কিছুর প্রয়োজন নাই, তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ছিল; তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহারা দুইজন পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও নারায হইয়াছেন। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

উপদেশঃ হে মানুষ! চিন্তা কর! প্রথমোক্ত দুইজন আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোক্‌র করে নাই বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই তাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা কতই না শোচনীয় হইয়াছে! কারণ, আল্লাহ্ তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিয়াছে বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাত সবই বহাল রহিয়াছে, ধন-সম্পদ কিছুই নষ্ট হয় নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা 'দিয়া ধন বুঝে মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' সাধারণতঃ মানুষ বড় হইলে অতীতের কথা ভুলিয়া যায়। এ ধরনের লোককে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। প্রকৃত মানুষ তাহারা—যাহারা অতীতের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র গোযারী করে।

৩ বখিলীর পরিণাম

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সাল্‌মার গৃহে কিছু হাদিয়ার গোশ্‌ত আসিয়াছিল। আমাদের হযরত (দঃ) গোশ্‌ত খাইতে ভালবাসিতেন। তাই পতিভক্তা উম্মে সাল্‌মা গোশ্‌তটুকু

হযরতের জন্য তুলিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে এক ভিক্ষুক গৃহদ্বারে আসিয়া হাঁক ছাড়িল—"আল্লাহ্‌র নামে খয়রাত দিন, আল্লাহ্ বরকত দিবেন।" গৃহমধ্যে হইতে জবাব আসিল, "বাবা, মাফ কর, আল্লাহ্ তোমাকেও বরকত দান করুক।" ইহার অর্থ হইল—তোমাকে দিবার মত বাড়ীতে কিছুই নাই। এই জবাব শুনিয়া ভিক্ষুক চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর হযরত (দঃ) গৃহে ফিরিয়া বিবি উম্মে সালামাকে বলিলেন, 'খাবার কিছু আছে কি?' হযরত উম্মে সালামা "জি-হাঁ" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ গোশ্‌ত আনিতে গেলেন। কিন্তু পাত্রের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ, উহাতে গোশ্‌তের নাম গন্ধও নাই। আছে মাত্র এক টুক্‌রা পাথর। তিনি সব কথা আঁ-হযরতের নিকট খুলিয়া বলিলেন। জবাবে আঁ-হযরত বলিলেন, বেশ হইয়াছে। তোমার পাষাণ হৃদয় ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলাও গোশ্‌তকে পাথরে পরিণত করিয়া তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

উপদেশঃ যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে দান না করিয়া শুধু নিজের উদর পূর্ণ করে, সে যেন পাথর উদরে পুরিল। এইরূপ করিতে করিতে শেষে তাহার হৃদয়ও পাষাণের মত হইয়া যায়। কিন্তু দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ পরিণাম সকলকে চর্মচক্ষে দেখান না।

৪ মিথ্যা, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপের শাস্তি

হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, প্রত্যহ ফজরের নামায শেষে ছাহাবীদের দিকে মুখ করিয়া বসিতেন এবং কেহ কোন খাব (স্বপ্ন) দেখিয়াছে কি না, বা কাহারও কোন কথা বলিবার আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। কোন কথা জানিতে চাহিলে হুযূর (দঃ) তাহাকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিতেন।

অভ্যাস মত এক দিন হযরত (দঃ) বলিলেন, কাহারও কিছু বলিবার আছে কি না? কেহ কিছু না বলায় তিনি নিজেই বলিলেন, আজ রাত্রে আমি অতি সুন্দর ও বিস্ময়কর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। (নবীদের খাব এবং ওহী সম্পূর্ণ সত্য হইয়া থাকে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।) দেখিলাম, দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া আমাকে হাতে ধরিয়া এক পবিত্র স্থানের দিকে লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমনের পর দেখিলাম, (১) একজন লোক বসিয়া আছে, আর একজন লোক তাহার নিকট দন্ডায়মান রহিয়াছে। দন্ডায়মান লোকটির হাতে একটি জম্বুরা রহিয়াছে। সে ঐ জম্বুরা দ্বারা উপবিষ্ট লোকটির মস্তক চিরিতেছে। একবার মুখের এক দিক দিয়া ঐ জম্বুরা ঢুকাইয়া দিয়া মাথার পিছন পর্যন্ত কাটিয়া ফেলে। আবার অন্য দিক দিয়াও এইরূপ করে। এক দিক কাটিয়া যখন অন্য দিক কাটিতে যায়, তখন প্রথম দিক পুনরায় জোড়া লাগিয়া ভাল হইয়া যায়। আবার ঐরূপভাবে কাটে আবার জোড়া লাগে। আমি এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুগণ! ব্যাপার কি? সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে চলিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, (২) এক জন লোক শুইয়া আছে, আর একজন লোক একখানা ভারী পাথর হাতে করিয়া তাহার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দাঁড়ান লোকটি ঐ পাথরের আঘাতে শোয়া লোকটির মাথা চুরচুর করিয়া দিতেছে। পাথরটি এত জোরে নিক্ষেপ করে যে, মস্তকটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বহুদূরে গিয়া নিক্ষিপ্ত হয়। লোকটি নিক্ষিপ্ত পাথরটি কুড়াইয়া আনিবার পূর্বেই বহুধা বিভক্ত মস্তক জোড়া লাগিয়া পূর্বের ন্যায় হইয়া যায়। সে ঐ পাথর কুড়াইয়া আনিয়া আবার মাথায় আঘাত করে এবং মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এইভাবে সে পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি ব্যাপার খুলিয়া বলুন। তাঁহারা কোন জবাব না দিয়া শুধু বলিলেন, আগে চলুন। আমরা আগে চলিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি প্রকাণ্ড গর্ত দেখিতে পাইলাম। গর্তটির মুখ সরু, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত গভীর এবং প্রশস্ত—যেন একটি তন্দুর, উহার ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে আর বহু সংখ্যক নর-নারী উহাতে দগ্ধীভূত হইতেছে। আগুনের তেজ এত অধিক যে, যেন আগুনের ঢেউ খেলিতেছে। ঢেউয়ের সঙ্গে যখন আগুন উচ্চ হইয়া উঠে, তখন লোকগুলি উথলিয়া গর্তের দ্বারেদেশে পৌঁছিয়া গর্ত হইতে বাহির হইবার উপক্রম হইয়া যায়। আবার যখন আগুন নীচে নামিয়া যায়, তখন লোকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া যায়। আমি ভীত হইয়া সঙ্গীগণকে বলিলাম, বন্ধুগণ! এবার বলুন এই ব্যাপার কি? কোন জবাব না দিয়াই তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি রক্তের নদী দেখিতে পাইলাম। তীরে একটি লোক দাঁড়ান আছে, ইহার নিকট স্তূপীকৃত কতকগুলি প্রস্তর রহিয়াছে। নদীর মধ্যে একটি লোক হাবুডুবু খাইয়া অতি কষ্টে কূলের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। তীরের নিকটবর্তী হইতেই তীরস্থ লোকটি তাহার মুখে এত জোরে পাথর নিক্ষেপ করে যে, সে আবার নদীর মাঝখানে চলিয়া যায়। এভাবে যখনই সে তীরের দিকে আসিতে চেষ্টা করে, তখনই তীরস্থ লোকটি পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়। এমন নির্মম ব্যবহার দর্শনে ভয়ে আমি স্তম্ভিত হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুগণ! বলুন একি ব্যাপার? তাঁহারা কোন জবাব দিলেন না; বলিলেন, আগে চলুন। আমরা আগে চলিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি সুন্দর শ্যামল উদ্যান দেখিতে পাইলাম। উদ্যানের মধ্যভাগে একটি অতি উচ্চ বৃক্ষ। উহার নিম্নে একজন বৃদ্ধলোক বসা আছে। বৃদ্ধের পার্শ্বদেশে অনেক বালক-বালিকা। বৃক্ষটির অপর পার্শ্বে আরও একজন লোক বসা অছে। তাহার সম্মুখে আগুন জ্বলিতেছে। ঐ লোকটি আগুনের মাত্রা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি করিতেছে। সঙ্গীদ্বয় আমাকে বৃক্ষে আরোহণ করাইতে লাগিলেন। বৃক্ষটির মাঝামাঝি গিয়া দেখিলাম, এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। এমন সুন্দর ও মনোরম অট্টালিকা ইহার পূর্বে কখনও আমি দেখি নাই। অট্টালিকার ভিতরে পুরুষ-স্ত্রী, বালক-বালিকা সকল শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। অট্টালিকা হইতে বাহিরে আসিয়া সঙ্গীদ্বয় আমাকে আরও উপরে লইয়া গেলেন। তথায় অপর একটি উত্তম অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম, উহার ভিতরে দেখিলাম শুধু বৃদ্ধ ও যুবক।

আমি সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, আপনারা আমাকে নানাস্থান ভ্রমণ করাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনিলেন। এখন বলুন দেখি, ঐসব কি ব্যাপার দেখিলাম?

সঙ্গীদ্বয় বলিলেন—

১। প্রথম যে লোকটির মস্তক ছেদন করা হইতেছে দেখিয়াছেন, সে লোকটির মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল। সে যে মিথ্যা বলিত তাহা দুনিয়াময় মশহুর হইয়া যাইত।

২। দ্বিতীয় নম্বর যে লোকটির মস্তক প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছিল, সে দুনিয়ায় আলেম ছিল। কোরআন হাদীস শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তদনুযায়ী নিজেও আমল করে নাই, অন্যকেও শিক্ষা দেয় নাই, যাহাতে এল্‌মে দ্বীন প্রচার হইতে পারিত। রাত্রে শুইয়া আরামে কাটাইত। আ'লমে বরযখে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাহার এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৩। তৃতীয় নম্বরে আপনি যাহাদের আগুনের তন্দুরের ভিতরে দেখিয়াছেন, তাহারা দুনিয়ায় ছিল ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৪। চতুর্থ নম্বরে আপনি যে লোকটিকে রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাইতে দেখিয়াছেন, সে ঘুষ, সুদ খাইয়া, চুরি করিয়া, এতীমের ও বিধবার মাল আত্মসাৎ করিয়া লোকের রক্ত শোষণ করিয়াছিল। কিয়ামত পর্যন্ত তাহার এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৫। (১) তৎপর বৃক্ষের নীচে যে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখিয়াছেন, তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। ছেলেপেলেগুলি মুসলমান নাবালেক ছেলেমেয়ে। আর (২) যিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছিলেন তিনি দোযখের দারোগা মালেক ফিরিশ্‌তা। বৃক্ষের উপর (৩) প্রথম যে অট্টালিকাটি দেখিয়াছেন উহা সাধারণ ঈমানদারদের বেহেশ্‌তের বাড়ীঘর। তৎপর (৪) দ্বিতীয় যে অট্টালিকাটি দেখিয়াছেন, উহা ঐ শহীদানের অট্টালিকা, যাহারা দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামের জন্য শহীদ হইয়াছেন। আমি জিব্‌রায়ীল ফেরেশ্‌তা এবং আমার সঙ্গের লোকটি মীকাঈল ফিরিশ্‌তা। [ইহার পর জিব্‌রায়ীল (আঃ) হযরত (দঃ)-কে বলিলেন] আপনি এখন উপরের দিকে দৃকপাত করুন। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া এক খণ্ড সাদা মেঘের মত দেখিলাম। জিব্‌রায়ীল (আঃ) বলিলেন, উহা আপনার অট্টালিকা। বলিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার অট্টালিকায় চলিয়া যাই। জিব্‌রায়ীল (আঃ) বলিলেনঃ এখনও সময় হয় নাই, এখনও দুনিয়ায় আপনার হায়াত বাকী আছে। দুনিয়ার জীবন শেষ হইলে পর তথায় যাইবেন।

উপদেশঃ এই হাদীস হইতে কয়েকটি বিষয়ের অবস্থা বুঝাইতেছে। প্রথমতঃ মিথ্যার কি ভয়াবহ সাজা। দ্বিতীয়তঃ বে-আমল আলেমের পরিণতি। তৃতীয়তঃ, যিনার প্রতিফল ও চতুর্থতঃ, সুদখোরের ভীষণ আযাব। আল্লাহ্‌ সকল মুসলমানকে এই সকল কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আমীন!

—o—

নিম্নে ছয়টি আদর্শ ঘটনা

১ ঈমানের মজবুতী

হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে দুরাচার পাপী নমরূদ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। তবুও তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীক্বা ত্যাগ করেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করিয়া দিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম সম্রাট ফেরআউন এবং কাফিরদের নির্মম অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া নিজকে নিজে লোহিত সাগরে নিক্ষেপ করিলেন তবুও তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীক্বা পরিত্যাগ করেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা গভীর সমুদ্রে শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি করিয়া দিলেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) অত্যন্ত কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সুদীর্ঘ আঠার বৎসরকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। দেশবাসীর নিকট ঘৃণিত ও অবহেলিত হইয়া রহিলেন। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সর্বস্ব হারাইয়া নিঃস্ব হইলেন। তথাপি তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীক্বা হইতে বিমুখ হন নাই। তাঁহার সঙ্গে শুধু তদীয় সতী-সাধ্বী পত্নী বিবি রহীমা স্বামী সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিলেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি ছবর করিয়া রহিলেন। ধৈর্যশীলতার দরুন আল্লাহ্ পাক তাঁহার ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্য সমস্তই ফিরাইয়া দিলেন।

হযরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালাম অগাধ ধনরাশি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁহার তরীক্বা বিস্মৃত হন নাই। আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দেন নাই। সময়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ন্যায়-নীতির সহিত সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন এবং যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র এবাদৎ-বন্দেগী করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই।

২ প্রতিজ্ঞা পালন

নুবুওত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা করিতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিয়া গেল, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি টাকা আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল, তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল না। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়ার কারণে ঐ স্থানে তিন দিন লোকটির অপেক্ষায় রহিলেন। চতুর্থ দিবসে লোকটি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু হুযূর (দঃ) তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন না। শুধু এতটুকু বলিলেন, ওয়াদায় আবদ্ধ, তাই তিন দিন যাবৎ আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।

৩ নাচ গান ও রং তামাশায় মন না দেওয়া

বাল্যকালে আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য বালকদের সঙ্গে বকরী চরাইতেন। রাখালেরা পালাক্রমে নাচ, বাদ্য ও রং তামাশা দেখার জন্য

শহরে গমন করিত। যে দিন আমাদের হযরতের পালা ছিল সে দিন তিনি (শহরে আসিয়া) মনে মনে ভাবিলেন, নাচ-বাদ্য ও রং তামাশা দেখিয়া নিদ্রা, স্বাস্থ্য ও সময় নষ্ট করা কি লাভ? তিনি আরামে নিদ্রা গেলেন। নাচ-বাদ্য ও রং তামাশায় যোগদান করিলেন না।

৪ সমাজ সেবা

নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত (দঃ) যখন যুবক ছিলেন, তখন তিনি একটি যুবক সমিতি গঠন করেন। সমিতির কর্মসূচী ছিল এই—

(ক) অসহায়, অনাথ, এতীম ও বিধবার সাহায্য করা।

(খ) বিদেশী মেহ্‌মানের সেবা করা।

(গ) বিদেশী পথচারী ও দুর্বলের উপর অত্যাচার অবিচার হইতে না দেওয়া।

(ঘ) কর্মহীনদের কর্মের সংস্থান করিয়া জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া।

(ঙ) আসমানী বালা-মুছীবতে মনুষ্য সমাজ বিপদগ্রস্ত হইলে চাঁদা ইত্যাদির দ্বারা সমাজকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করা।

৫ আমানতে খেয়ানত করা

কাফিরগণ যখন আমাদের নূর নবীর উপর অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়নে তৎপর, এমন কি শত্রুগণ যখন তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন সতরজন বিশিষ্ট পাহ্‌লোয়ান তরবারি হস্তে তাঁহার গৃহ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আল্লাহ্‌র অপার মহিমা! ঐ রাত্রেই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হইল—মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিতে। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে বিলম্ব করিলেন না, করিতেও পারেন না। কাফিরদের অনেক টাকা-পয়সা তাঁহার নিকট আমানত ছিল। তিনি বালক আলীকে বলিলেন, প্রিয় বৎস! এই রাত্রে আমার বিছানায় শুইয়া থাকিবে। প্রাতে যাহার যে আমানত আছে, তাহা তাহাকে দিয়া দিবে। পারিবে তো? হযরত আলী নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, আল্লাহ্ চাহেন ত পারিব।

হযরত আলী আঁ-হযরতের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। এদিকে হযরত (দঃ) শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহারা বিন্দুমাত্রও টের পাইল না। প্রত্যুষে কাফির দল গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা চাদরাবৃত আলীকে হযরত (দঃ) মনে করিয়া কেহ বলিল, এক কোপেই শেষ করিয়া ফেল। কেহ বাধা দিয়া বলিল, না না, নিদ্রাবস্থায় হত্যা করা কাপুরুষতার পরিচায়ক। এরূপ বলাবলি করিতে করিতে একজন চাদর টান দিয়া দেখিল, এ তো তাহাদের শিকার (হযরত) মুহাম্মদ (দঃ) নয়, এ যে আলী শুইয়া আছে! তাহারা বিস্মিত হইল। হযরত আলী দেখাইলেন, গচ্ছিত দ্রব্যসমূহ ফেরত দিবার জন্য, আমানতের হেফাযতের জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ইহাকেই বলে আমানতদারী, ইহারই নাম বিশ্বস্ততা।

৬ রিপু দমন ও সংযম অভ্যাস

হযরত ইউসুফ (আঃ) তখনও নবী হন নাই। যৌবনের উদ্দাম সময়। তিনি অবস্থান করেন মিসরের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে। যদিও যালেমেরা তাঁহাকে গোলাম বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, তথাপি মন্ত্রী এবং তাহার বেগম ছাহেবা তাঁহাকে অত্যধিক স্নেহ ও আদর করেন। বেগম ছাহেবার

নাম যোলায়খা। তিনি ছিলেন অনুপমা সুন্দরী। হযরত ইউসুফের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া যোলায়খা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। একদিন গৃহের দরজা জানালা তালাবদ্ধ করিয়া যোলায়খা ইউসুফকে তাঁহার খাছ কামরায় আহ্বান করিলেন। ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা! যোলায়খা ইউসুফকে তাঁহার সহিত প্রেম করিবার জন্য ফুসলাইতে লাগিলেন। ইউসুফ (আঃ) মহা সংকটে পড়িলেন। দরজা তালাবদ্ধ, পালাবার কোন উপায় নাই। তিনি প্রমাদ গণিলেন। এই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া তিনি খোদার দরবারে বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি খাঁটি দেলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়, আল্লাহ্ তাহাকে আশ্রয় দেন। যদিও গৃহদ্বার তালাবদ্ধ, তথাপি ভাবিলেন, আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব ততদূর চেষ্টা আমাকে করিতেই হইবে। তিনি হঠাৎ দরজার দিকে দৌঁড়াইয়া গেলেন। দরজার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌র অসীম কৃপা ও কুদরতে একে একে সাতটি দরজার তালা আপনাআপনি খুলিয়া গেল। যোলায়খাও তাঁহার পিছনে পিছনে দৌঁড়াইয়া পিছন দিক হইতে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার আঁচল ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন, ফলে জামার আঁচল ছিঁড়িয়া গেল এবং যোলায়খার অপচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইউসুফ (আঃ) নিস্তার পাইলেন এবং চরিত্রকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইলেন। যোলায়খার ষড়যন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ (আঃ)-কে সাত বৎসরের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। ইউসুফ (আঃ) হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিয়া বলিতে লাগিলেন, করুণাময় খোদা! চরিত্র অপবিত্র করার চেয়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকা শত গুণে শ্রেয়ঃ।

যোলায়খার মনোবাসনা পূর্ণ করিলে ইউসুফ (আঃ) কতই না আরামে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু ইউসুফ (আঃ) যৌন-লালসার ফাঁদে পড়িলেন না, কারাগারের কষ্টকে অকাতরে গ্রহণ করিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভয়ে আপন নির্মল চরিত্রকে কলুষিত করেন নাই। তিনি বিশ্বে যে সংযমের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনুধাবন ও অনুসরণযোগ্য। এই ঘটনার বিবরণ কোরআনে পাকেও উল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসেও তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে এবং থাকিবে।

—অনুবাদক

—o—

আক্বীদার[১] কথা

১। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য দৃশ্য-অদৃশ্য যাহাকিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, প্রথমে তাহা কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা পরে এসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

২। আল্লাহ্ এক, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী বা মোহ্তাজ[২] নহেন, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই, তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তাঁহার মোকাবেলা[৩] কেহ নাই।

৩। তিনি অনাদি এবং অনন্ত, সকলের পূর্ব হইতে আছেন, তাঁহার শেষ নাই।

৪। কোন কিছুই তাঁহার অনুরূপ হইতে পারে না। তিনি সর্বাপেক্ষা বড় এবং সকল হইতে পৃথক্!

৫। তিনি জীবিত আছেন। সর্ববিষয়ের উপর তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে। সৃষ্টজগতে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। তিনি সবকিছুই দেখেন, সবকিছুই শুনেন। তিনি কথা বলেন; কিন্তু তাঁহার কথা আমাদের কথার ন্যায় নহে। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তিনি করেন, কেহই তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না।

একমাত্র তিনিই এবাদতের যোগ্য; অর্থাৎ, অন্য কাহারও বন্দেগী করা যাইতে পারে না। তাঁহার কোনই শরীক নাই। তিনি মানুষের উপর বড়ই মেহেরবান। তিনি বাদশাহ্। তাঁহার মধ্যে কোনই আয়েব বা দোষ-ত্রুটি নাই। তিনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব-শেকায়েৎ হইতে একেবারে পবিত্র। তিনি মানুষকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনিই প্রকৃত সম্মানী। তিনিই প্রকৃত বড়। তিনি সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহই সৃষ্টি করে নাই। তিনিই মানুষের গুনাহ্ মা'ফ করেন। তিনি জবরদস্ত ও পরাক্রমশালী, বড়ই দাতা। তিনিই সকলকে রুজি দেন এবং আহার দান করেন। তিনিই যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রুজি কম করিয়া দেন, আবার যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রুজি বৃদ্ধি করিয়া দেন, তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী কাহাকেও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, আবার কাহারও মান-মর্যাদা হ্রাস করিয়া দেন। মান-সম্মান হ্রাস-বৃদ্ধির অধিকারী তিনিই; অবমাননা, অসম্মান করার মালিকও তিনিই। তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু। যে তাঁহার সামান্য এবাদতও করে, তিনি তাহার বড়ই কদর করেন অর্থাৎ সওয়াব দেন। তিনি দো'আ কবুল করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত।

তাঁহার আধিপত্য সকলের উপর; তাঁহার উপর কাহারও আধিপত্য নাই। তাঁহার হুকুম সকলেই মানিতে বাধ্য; তাঁহার উপর কাহারও হুকুম চলে না। তিনি যাহাকিছু করেন সকল কাজেই হিক্‌মত

টিকা

১ কোন বিষয় মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আক্বীদা বলে। শরীঅত যে বিষয়কে যেমন বাতাইয়াছে তাহা ঠিক তেমনই, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। বিন্দুমাত্রও শক-শোবাহ (সন্দেহ) করা যাইতে পারে না, ইহারই নাম আক্বীদা।

২ অর্থাৎ, তাঁহার কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রয়োজন হয় না।

৩ অর্থাৎ, তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই যে তাঁহার মোকাবেলা করিতে পারে।

থাকে, (তাঁহার কোন কাজই হিক্‌মত ছাড়া হয় না। তাঁহার সব কাজই ভাল। তাঁহার কোন কাজে দোষের লেশমাত্রও থাকে না।) তিনি সকলের চেষ্টাকে ফলবতী করেন। তাঁহার সাহায্যেই সকলকে পয়দা করিবেন। তিনিই জীবনদাতা এবং তিনিই মৃত্যুদাতা। ছিফৎ (গুণাবলী) এবং নিদর্শন দ্বারা সকলেই তাঁহাকে জানে; কিন্তু তাঁহার যাতের বারিকী বা সূক্ষ্মতত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না। তিনি গুণাহ্‌গারের তওবা[১] কবূল করিয়া থাকেন। যাহারা শাস্তির যোগ্য তাহাদিগকে শাস্তি দেন। তিনিই হেদায়ত করেন, অর্থাৎ যাহারা সৎপথে আছে তাহাদিগকে তিনিই সৎপথে রাখেন। দুনিয়াতে যাহাকিছু ঘটে, সমস্ত তাঁহারই হুকুমে এবং তাঁহারই কুদরতে ঘটিয়া থাকে। তাঁহার কুদরত এবং হুকুম ব্যতীত একটি বিন্দুও নড়িতে পারে না। তাঁহার নিদ্রাও নাই, তন্দ্রাও নাই। নিখিল বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার একটুও কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ হয় না। (তিনিই সমস্ত কিছু রক্ষা করিতেছেন।) ফলকথা, তাঁহার মধ্যে যাবতীয় সৎ ও মহৎ গুণ আছে এবং দোষ-ত্রুটির নামগন্ধও তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে অতি পবিত্র।

৬। তাঁহার যাবতীয় গুণ অনাদিকাল হইতে আছে এবং চিরকালই থাকিবে। তাঁহার কোন গুণই বিলোপ বা কম হইতে পারে না।

৭। জ্বিন ও মানব ইত্যাদি সৃষ্টবস্তুর গুণাবলী হইতে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র[২] কিন্তু কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে—যাহা আমাদের মধ্যে আছে তাহা আল্লাহ্‌রও আছে বলিয়া উল্লেখ আছে (যেমন, বলা হইয়াছে—আল্লাহ্‌র হাত) তথায় এই রকম ঈমান রাখা দরকার যে, ইহার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌ই জানেন। আমরা বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া এই ঈমান এবং এক্বীন রাখিব যে, ইহার অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট যাহাই হউক না কেন, তাহাই ঠিক এবং সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। এইরূপ ধারণা রাখাই ভাল। তবে কোন বড় মুহাক্কেক্ আলেম এরূপ শব্দের কোন সুসঙ্গত অর্থ বলিলে তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ বলা সকলের কাজ নহে। যাহারা আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা তাঁহারাই বলিতে পারেন; তাহাও শুধু তাঁহারই বুদ্ধি মত; নতুবা আসল এক্বীনী অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এইরূপ শব্দ বা কথা যাহা বুঝে আসে না, সেইগুলিকে 'মুতাশাবেহাত' বলা হয়।

৮। সমগ্র দুনিয়ার ভালমন্দ যাহাকিছু হউক না কেন, সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলা উহা হওয়ার পূর্বেই আদিকাল হইতে অবগত আছেন। তিনি যাহা যে-রূপ জানেন তাহা সেইরূপই পয়দা করেন

টিকা

১ ঘটনাক্রমে কোন গুনাহ্ হইয়া গেলে আল্লাহ্‌র সামনে নেহায়ত লজ্জিত ও শরমিন্দা হইয়া মা'ফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনও আমি এরূপ কাজ করিব না, ইহাকেই 'তওবা' বলে।

২ আল্লাহ্ স্রষ্টা। আল্লাহ্ ব্যতীত দৃশ্য-অদৃশ্য যতকিছু আছে, যথা আসমান, জমীন ফিরিশ্‌তা জ্বিন, মানব, চন্দ্র, সূর্য, 'আর্‌শ, কুরসী, লওহ্ ও ক্বলম ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ। সমস্তই সাকার, সীমাবদ্ধ, ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহারও তুলনা হইতে পারে না বা আল্লাহ্‌র অনুরূপ কিছুই নাই। কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে অনুরূপ শব্দ যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেহ আল্লাহ্‌কে অনুরূপ মনে করিবে না। আল্লাহ্ ইহা হইতে বহু বহু ঊর্ধ্বে। মানবের বুদ্ধি বিবেকও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং মানবের বুদ্ধি-বিবেকের সীমা দ্বারা আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ নহেন। আল্লাহ্ অসীম, নিরাকার, নিরঞ্জন, অনাদি, অনন্ত ও তাঁহার দেখা, শুনা, কথাবলা, হাসা, তাঁহার হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি তিনি যেমন মহান এবং পবিত্র তাঁহার এই সমস্ত গুণও তদ্রূপ মহান এবং পবিত্র।

ইহাকেই 'তক্‌দীর' বলে। আর মন্দ জিনিস পয়দা করার মধ্যে অনেক হিক্‌মত নিহিত আছে। ইহা সকলে বুঝিতে পারে না।

৯। মানবকে আল্লাহ্ তা'আলা বুদ্ধি অর্থাৎ ভালমন্দ বিবেচনা শক্তি এবং (ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া নিজ) ইচ্ছা (ও ক্ষমতায় কাজ করিবার শক্তি) দান করিয়াছেন। এই শক্তি দ্বারাই মানুষ সৎ, বা অসৎ, সওয়াব বা গুনাহ্ নিজ ক্ষমতায় করে; (কিন্তু কোনকিছু পয়দা করিবার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয় নাই।) গুনাহ্‌র কাজে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং নেক কাজে সন্তুষ্ট হন।

১০। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহাদের শক্তির বাহিরে কোন কাজ করিবার আদেশ করেন নাই।

১১। আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নহে। তিনি যাহাকিছু মেহেরবানী করিয়া করেন, সমস্তই শুধু তাঁহার কৃপা এবং অনুগ্রহ মাত্র। (কিছু বান্দাদের নেক্ কাজে যে সমস্ত সওয়াব নিজেই মেহেরবানী করিয়া দিতে চাহেন তাহা নিশ্চয়ই দিবেন, যেন তাহা ওয়াজিবেরই মত।)

১২। বহুসংখ্যক পয়গম্বর মানব এবং জ্বিন জাতিকে সৎপথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন; (আমাদিগকে তাহা বলা হয় নাই।) তাঁহাদের সত্যতার প্রমাণ (জনসাধারণকে) দেখাইবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা এমন কতিপয় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কঠিন কঠিন কাজ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাহা অন্য লোক করিতে পারে না। এই ধরনের কাজকে মো'জেযা বলে।

পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ ছিলেন আমাদের হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম)। অন্যান্য সব পয়গম্বর এই দুইজনের মধ্যবর্তী সময়ে অতীত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন পয়গম্বরের নাম অনেক মশ্‌হুর; যেমন— হযরত নূহ্ (আঃ), হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারূন (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইল্‌ইয়াস (আঃ), হযরত আল ইয়াছা'আ (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত লুৎ (আঃ), হযরত ইদ্রীস (আঃ), হযরত যুলকিফ্‌ল (আঃ), হযরত ছালেহ্ (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত শো'আইব (আঃ)।

১৩। পয়গম্বরদের মোট সংখ্যা কত তাহা আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও বলিয়া দেন নাই। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যত পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, সকলকেই সত্য ও খাঁটি বলিয়া মান্য করিতে হইবে। যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই পয়গম্বর, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

১৪। পয়গম্বরদের মধ্যে কাহারও মর্তবা কাহারও চেয়ে অধিক। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্তবা আমাদের হুযূর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর। তাঁহার পর আর কোন নূতন পয়গম্বর কিয়ামত পর্যন্ত আসিবে না, আসিতে পারে না। কেন না কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্ট হইবে, সকলের জন্যই তিনি পয়গম্বর।

১৫। আমাদের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় এক রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা শরীফ হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং তথা হইতে সাত আসমানের উপর এবং তথা হইতে যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী হইয়াছিল সে পর্যন্ত উঠাইয়া আবার মক্কা শরীফে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন; ইহাকে 'মে'রাজ' শরীফ বলে।

১৬। আল্লাহ্ তা'আলা কিছুসংখ্যক জীব নূর দ্বারা পয়দা করিয়া তাহাদিগকে আমাদের চর্ম চক্ষুর আড়ালে রাখিয়াছেন। তাহাদিগকে 'ফিরিশ্‌তা' বলে। অনেক কাজ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহারা কখনও আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ কোন কাজ করেন না। যে কাজে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন সে কাজেই লিপ্ত আছেন। এই সমস্ত ফিরিশ্‌তার মধ্যে চারিজন ফিরিশ্‌তা অনেক মশ্‌হুরঃ (১) হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ), (২) হযরত মীকায়ীল (আঃ), (৩) হযরত ইসরাফীল (আঃ), (৪) হযরত ইযরায়ীল (আঃ)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছুসংখ্যক জীব অগ্নি দ্বারা পয়দা করিয়াছেন, তাহাদিগকেও আমরা দেখিতে পাই না। ইহাদিগকে 'জ্বিন' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ, নেক্‌কার, বদ্‌কার সব রকমই আছে। ইহাদের ছেলেমেয়েও জন্মে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মশ্‌হুর দুষ্ট বদমাআ'শ হইল—ইবলীস।

১৭। মুসলমান যখন অনেক এবাদত বন্দেগী করে, গুনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রাখে না এবং পয়গম্বর ছাহেবের পূর্ণ তাবে'দারী করে, তখন সে আল্লাহ্‌র দোস্ত এবং খাছ পিয়ারা বান্দায় পরিণত হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র "ওলী" বলে। আল্লাহ্‌র ওলীদের দ্বারা সময় সময় এ রকম কাজ হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ লোক দ্বারা হইতে পারে না, এই রকম কাজকে 'কারামত' বলে।

১৮। ওলী যত বড়ই হউক না কেন, কিন্তু নবীর সমান হইতে পারে না।

১৯। যত বড় ওলীই হউক না কেন, কিন্তু যে পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক থাকে সে পর্যন্ত শরীঅতের পাবন্দী করা তাঁহার উপর ফরয। নামায, রোযা ইত্যাদি কোন এবাদতই তাহার জন্য মা'ফ হইতে পারে না। যে সকল কাজ শরীঅতে হারাম বলিয়া নির্ধারিত আছে তাহাও তাঁহার জন্য কখনও হালাল হইতে পারে না।

২০। শরীঅতের খেলাফ করিয়া কিছুতেই খোদার দোস্ত (ওলী) হওয়া যায় না।[১] এইরূপ 'খেলাফে শরআ' (শরীঅত বিরোধী) লোক দ্বারা যদি কোন অদ্ভুদ ও অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হইতে থাকে, তবে তাহা হয় যাদু, না হয় শয়তানের ধোঁকাবাজী। অতএব, এইরূপ লোককে কিছুতেই বুযুর্গ মনে করা উচিত নহে।

২১। আল্লাহ্‌র ওলীগণ কোন কোন ভেদের কথা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় জানিতে পারেন, ইহাকে 'কাশ্‌ফ, বা এলহাম' বলে। যদি তাহা শরীঅত সম্মত হয়, তবে তাহা গ্রহণযোগ্য অন্যথায় গ্রহণযোগ্য নহে।

২২। আল্লাহ্ এবং রসূল কোরআন, হাদীসে দ্বীন (ধর্ম) সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বলিয়া দিয়াছেন। এখন দ্বীন সম্পর্কে কোন নূতন কথা আবিষ্কার করা বৈধ নহে। এইরূপ (দ্বীন সম্বন্ধীয়) নূতন কথা আবিষ্কারকে 'বেদ্‌আত' বলে; ইহা বড়ই গুনাহ্।

টিকা

১ অনেক সময় জিন তাবে' করিয়া বা নফ্‌সের তাছার্‌রোফের দ্বারা অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করা হয়, ইহাতে বুযুর্গী কিছুই নাই।

২৩। পয়গম্বরগণ যাহাতে নিজ নিজ উম্মতদিগকে ধর্মের কথা শিক্ষা দিতে পারেন, সেই জন্য তাঁহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ছোট বড় অনেকগুলি আসমানী কিতাব জিব্‌রায়ীল (আঃ) মা'রেফত নাযিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারিখানা কিতাব অতি মশহুর— (১) তৌরাত— হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর (২) যাবূর— হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর, (৩) ইঞ্জীল— হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর এবং (৪) কোরআন শরীফ—আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে। কোরআন শরীফই শেষ আসমানী কিতাব। কোরআনের পর আর কোন কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নাযিল হইবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন শরীফের হুকুমই চলিতে থাকিবে। অন্যান্য কিতাবগুলি গোমরাহ্ লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু কোরআন শরীফের হিফাযতের ভার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই লইয়াছেন। অতএব, ইহাকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

২৪। আমাদের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সমস্ত মুসলমান দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে 'ছাহাবী' বলা হয়। ছাহাবীদের অনেক বুযুর্গীর কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই মহব্বত এবং ভক্তি রাখা আবশ্যক। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদ যদি কিছু শোনা যায় তাহা ভুল-ত্রুটিবশতঃ হইয়াছে মনে করিতে হইবে; (কারণ, মানব মাত্রেরই ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকে।) সুতরাং তাঁহাদের কাহাকেও নিন্দা করা যায় না। ছাহাবীদের মধ্যে চরিজন ছাহাবী সবচেয় বড়। হযরত আবুবক্‌র ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু পয়গম্বর ছাহেবের পর তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে দ্বীন ইসলাম রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন, তাই তাঁহাকে প্রথম খলীফা বলা হয়। সমস্ত উম্মতে-মুহাম্মদীর তিনিই শীর্ষস্থানীয়। তারপর হযরত 'ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু দ্বিতীয় খলীফা হন। তারপর হযরত 'ওস্‌মান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তৃতীয় খলীফা হন, পরে হযরত 'আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু চতুর্থ খলীফা হইয়াছিলেন।

২৫। ছাহাবীদের মর্তবা এত উচ্চস্থানীয় যে, বড় হইতে বড় ওলীও ছোট হইতে ছোট ছাহাবীর সমতুল্য হইতে পারে না।

২৬। পয়গম্বর ছাহেবের সকল পুত্র-কন্যা এবং বিবি ছাহেবাগণের প্রতিও সম্মান ও ভক্তি করা আমাদের কর্তব্য। সন্তানের মধ্যে হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার মর্তবা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং বিবি ছাহেবানদের মধ্যে হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ও হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হার মর্তবা সবচেয়ে বেশী।

২৭। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল যাহাকিছু বলিয়াছেন, সকল বিষয়কেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এবং মানিয়া লওয়া ব্যতীত ঈমান ঠিক হইতে পারে না। কোন একটি কথায়ও সন্দেহ পোষণ করিলে বা মিথ্যা বলিয়া মনে করিলে বা কিছু দোষ-ত্রুটি ধরিলে বা কোন একটি কথা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলে মানুষ বে-ঈমান হইয়া যায়।

২৮। কোরআন হাদীসের স্পষ্ট অর্থ অমান্য করিয়া নিজের মত পোষণের জন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্য অর্থ গ্রহণ বদ্-দ্বীনির কথা।

২৯। গুনাহ্‌কে হালাল জানিলে ঈমান থাকে না।

৩০। গুনাহ্ যত বড়ই হউক না কেন, যে পর্যন্ত উহা গুনাহ্ এবং অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিবে, সে পর্যন্ত ঈমান একেবারে নষ্ট হইবে না, অবশ্য ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িবে।

৩১। যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার (আযাবের) ভয় কিংবা (রহ্মতের) আশা নাই—সে কাফির।

৩২। যে কাহারো কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তাহাতে বিশ্বাস করে, সে কাফির।

৩৩। গায়েবের কথা এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কেহই অবগত নহে। হাঁ, পয়গম্বর ছাহেবান ওহী মারফত, ওলীআল্লাহ্গণ কাশ্ফ্ ও এল্হাম মারফত এবং সাধারণ লোক লক্ষণ দ্বারা যে, কোন কোন কথা জানিতে পারেন তাহা গয়েব নহে।

৩৪। কাহাকেও নির্দিষ্ট করিয়া "কাফির" কিংবা এইরূপ বলা যে, নির্দিষ্টভাবে 'অমুকের উপর খোদার লা'নত হউক' তাহা অতি বড় গুণাহ্। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অত্যাচারীদের উপর খোদার লা'নত হউক। কিন্তু যাহাকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল কাফির বলিয়াছেন, তাহাকে (নির্দিষ্টভাবে) কাফির বলা যাইতে পারে। (যথা—ফির'আউন, বা অন্য যাহাকে তাঁহারা লা'নত করিয়াছেন তাহার উপর লা'নত করা।)

৩৫। মানবের মৃত্যুর পর (যদি কবর দেওয়া হয়, তবে কবর দেওয়ার পর আর যদি কবর দেওয়া না হয়, তবে যে অবস্থায়ই থাকুক সে অবস্থাতেই তখন) তাহার নিকট মুন্কার এবং নকীর নামক দুইজন ফিরিশ্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেনঃ 'তোমার মা'বুদ কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কি? এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? যদি মুব্দা ঈমানদার হয়, তবে তো ঠিক ঠিক জওয়াব দেয় অতঃপর খোদার পক্ষ হইতে তাহার জন্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। বেহেশ্তের দিকে ছিদ্রপথ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে সুশীতল বায়ু এবং নির্মল সুগন্ধ প্রবেশ করিতে থাকে, আর সে পরম সুখের নিদ্রায় ঘুমাইতে থাকে। আর মৃত ব্যক্তি ঈমানদার না হইলে, সে সকল প্রশ্নের জওয়াবেই বলেঃ আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানি না।' অনন্তর তাহাকে কঠিন আযাব দেওয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এই কঠিন আযাব ভোগ করিতে থাকিবে। আর কোন বন্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এইরূপ পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি দিয়া থাকেন; কিন্তু এই সকল ব্যাপার মৃত ব্যক্তিই জানিতে পারে, আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখিতে পায়, আমরা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিকটে থাকিয়াও তাহা দেখিতে পাই না।

৩৬। মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তাহার আসল ও স্থায়ী বাসস্থান দেখান হয়। যে বেহেশ্তী হইবে তাহাকে বেহেশ্ত দেখাইয়া তাহার আনন্দ বর্ধন করা হয়, দোযখীকে দোযখ দেখাইয়া তাহার কষ্ট এবং অনুতাপ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

৩৭। মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ বা কিছু দান খয়রাত করিয়া উহার সওয়াব তাহাকে বখ্শিয়া দিলে তাহা সে পায় এবং উহাতে তাহার বড়ই উপকার হয়।

৩৮। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল কিয়ামতের যে সমস্ত 'আলামত বর্ণনা করিয়াছেন উহার সবগুলি নিশ্চয় ঘটিবে। ইমাম মাহ্দী (আঃ) আগমন করিবেন এবং অতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজত্ব করিবেন। কানা দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে এবং দুনিয়ার মধ্যে বড় ফেৎনা ফাসাদ করিবে। হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। ইয়াজুজ মা'জুজ (এক জাতি) সমস্ত দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িবে এবং সব তছ্নছ করিয়া ফেলিবে; অবশেষে খোদার গযবে ধ্বংস হইবে। এক অদ্ভুত জীব মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইবে এবং মানুষের সহিত কথা বলিবে। সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, (এবং পশ্চিম দিকেই অস্ত যাইবে।) কোরআন

মজীদ উঠিয়া যাইবে এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত মুসলমান প্রাণ ত্যাগ করিবে। শুধু কাফিরই কাফির থাকিয়া যাইবে। (তাহাদের উপর কিয়ামত কায়েম হইবে।) এই রকম আরও অনেক 'আলামত আছে।

৩৯। যখন সমস্ত 'আলামত প্রকাশ হইয়া যাইবে, তখন হইতে কিয়ামতের আয়োজন শুরু হইবে। হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। (এই সিঙ্গা শিং-এর আকারের প্রকাণ্ড' এক রকম জিনিস) সিঙ্গায় ফুঁক দিলে আসমান জমিন সমস্ত ফাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবে, যাবতীয় সৃষ্ট জীন মরিয়া যাইবে। আর যাহারা পূর্বে মারা গিয়াছিল তাহাদের রূহ্ বেহুশ হইয়া যাইবে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিবেন সে নিজের অবস্থায়ই থাকিবে। এই অবস্থায়ই দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবে।

৪০। আবার যখন আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত আলম পুনর্বার সৃষ্টির ইচ্ছা করিবেন, তখন দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে এবং সমস্ত আলম জীবিত হইয়া উঠিবে। সমস্ত মৃত লোক জীবিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্র হইবে এবং তথাকার অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সুপারিশ করাইবার জন্য পয়গম্বরদের কাছে যাইবে, কিন্তু সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। পরিশেষে আমাদের পয়গম্বর ছাহেব আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি লইয়া সুপারিশ করিবেন। নেকী-বদি পরিমাপের পাল্লা (মীযান) স্থাপন করা হইবে। ভাল-মন্দ সমস্ত কর্মের পরিমাণ ঠিক করা হইবে এবং তাহার হিসাব হইবে। কেহ কেহ বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। নেক্‌কারদের আ'মলনামা তাঁহাদের ডান হাতে এবং গুনাহ্‌গারদের আ'মলনামা তাহাদের বাম হাতে দেওয়া হইবে। আমাদের পয়গম্বর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার (নেক) উম্মতকে হাওযে কাওছারের পানি পান করাইবেন। সেই পানি দুধ হইতেও সমধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। সকলকে পুলছিরাত পার হইতে হইবে। নেক্‌কারগণ সহজে উহা পার হইয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছিবেন, আর পাপীরা উহার উপর হইতে দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।

৪১। দোযখ এখনও বর্তমান আছে। তাহাতে সাপ, বিচ্ছু এবং আরও অনেক কঠিন কঠিন আযাবের ব্যবস্থা আছে। যাহাদের মধ্যে একটুকুও ঈমান থাকিবে, যতই গুনাহ্‌গার হউক না কেন, তাহারা নিজ নিজ গুনাহ্‌র পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নবীগণের এবং বুযুর্গদের সুপারিশে নাজাত পাইয়া বেহেশ্‌তে যাইবে। আর যাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান নাই অর্থাৎ, যাহারা কাফির ও মুশ্‌রিক, তাহারা চিরকাল দোযখের আযাবে নিমজ্জিত থাকিবে, তাহাদের মৃত্যুও হইবে না।

৪২। বেহেশ্‌তও এখন বিদ্যামান আছে। সেখানে অসংখ্য প্রকারের সুখ-শান্তি এবং আমোদ-প্রমোদের উপকরণ মৌজুদ রহিয়াছে। যাঁহারা বেহেশ্‌তী হইবেন কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা তাঁহাদের থাকিবে না। সেখানে তাঁহারা চিরকাল অবস্থান করিবেন। তাঁহাদিগকে কখনও তথা হইতে বহিষ্কার করা হইবে না; আর তাহাদের মৃত্যুও হইবে না।

৪৩। ছোট হইতে ছোট গুনাহ্‌র কারণেও আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন, আবার বড় হইতে বড় গুনাহ্‌ও তিনি মাত্রও শাস্তি না দিয়া মেহেরবানী করিয়া নিজ রহ্‌মতে মা'ফ করিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলার সব কিছুরই ক্ষমতা আছে।

৪৪। শির্‌ক এবং কুফরির গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও মা'ফ করিবেন না; তদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা মা'ফ করিয়া দিবেন। তাঁহার কোন কাজে কেহ বাধা দিতে পারে না।

৪৫। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রসূল যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া বেহেশ্‌তী বলিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমরা সুনিশ্চিতভাবে বেহেশ্‌তী হওয়া সাব্যস্ত করিতে পারি না। তবে নেক আলামত দেখিয়া (অর্থাৎ, আমল আখ্‌লাক ভাল হইলে) ভাল ধারণা এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা করা কর্তব্য।

৪৬। বেহেশ্‌তে আরামের জন্য অসংখ্য নেয়ামত এবং অপার আনন্দের অগণিত সামগ্রী মওজুদ আছে। সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে অধিক আনন্দদায়ক নেয়ামত হইবে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ। বেহেশ্‌তীদের ভাগ্যে এই নেয়ামত জুটিবে। এই নেয়ামতের তুলনায় অন্যান্য নেয়ামত কিছুই নয় বলিয়া মনে হইবে।

৪৭। জাগ্রত অবস্থায় চর্ম-চক্ষে এই দুনিয়ায় কেহই আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখে নাই, দেখিতে পারেও না। (অবশ্য বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে দেখিতে পাইবে)।

৪৮। সারা জীবন যে যে-রূপই হউক না কেন, কিন্তু খাতেমা (অন্তিমকাল) হিসাবেই ভালমন্দের বিচার হইবে। যাহার খাতেমা ভাল হইবে সে-ই ভাল এবং সে পুরস্কারও পাইবে ভাল, আর যাহার খাতেমা মন্দ হইবে (অর্থাৎ, বে-ঈমান হইয়া মরিবে) সে-ই মন্দ এবং তাহাকে ফলও ভোগ করিতে হইবে মন্দ।

৪৯। সারা জীবনের মধ্যে মানুষ যখনই তওবা[১] করুক বা ঈমান আনুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা কবূল করেন, কিন্তু মৃত্যুকালে যখন প্রাণ বাহির হইতে থাকে এবং আযাবের ফেরেশ্‌তাকে নজরে দেখিতে পায়, তখন অবশ্য তওবাও কবূল হয় না এবং ঈমানও কবূল হয় না।

ঈমান এবং আক্বায়েদের পর কিছু খারাব আক্বীদা ও খারাব প্রথা এবং কিছুসংখ্যক বড় বড় গুনাহ্ যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং যাহার কারণে ঈমানে নোক্‌ছান আসিয়া পড়ে তাহা বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি, যেন জনগণ সে-সব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে কোনটি ত একেবারেই কুফর ও শিরক্‌মূলক, কোনটি প্রায়ই কুফর ও শিরক্‌মূলক, কোনটি বেদ্‌আত এবং গোমরাহী, আর কোনটি শুধু গুনাহ্। মোটকথা, ইহার সবগুলি হইতেই বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক। আবার যখন এইগুলির বর্ণনা শেষ হইবে, তখন গুনাহ্ করিলে দুনিয়াতেই যে-সব ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করিলে দুনিয়াতেই যে-সব লাভ হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ দুনিয়ার লাভ-লোকসানের দিকেই বেশী লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাই হয়ত কেহ এই ধারণায়ও কোন নেক কাজ করিতে পারে বা কোন গুনাহ্ হইতে দূরে থাকিতে পারে।

শির্‌ক ও কুফ্‌র

কুফ্‌র পছন্দ করা, কুফরী কোন কাজ বা কথাকে ভাল মনে করা[২] অন্য কাহারও দ্বারা কুফ্‌রমূলক কোন কাজ করান বা কুফ্‌রমূলক কোন কথা বলান, কোন কারণবশতঃ নিজের

টিকা

১ গুনাহ্ পরিত্যাগ করত অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াকে তওবা বলে এবং কুফ্‌র ও শিরক্ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র ইস্‌লাম ধর্মের এবং আল্লাহ্‌র পয়গম্বরকে মানিবার অঙ্গীকার করাকে 'ঈমান' বলে।

২ আজকাল কোন কোন ধর্মজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী যুবক হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রশংসা করিয়া ইসলামের নিন্দা করিয়া থাকে। ইহাতে ঈমান থাকে না।

মুসলমান হওয়ার উপর আক্ষেপ করা যে, হায়! যদি মুসলমান না হইতাম, তবে এই রকম উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম বা এই রকম সম্মান পাইতাম ইত্যাদি (নাঊযু বিল্লাহে মিন যালিক)। সন্তান বা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে এই রকম কথা বলাঃ 'খোদা তা'আলা মারিবার জন্য সংসারে আর কাহাকেও পায় নাই; বাছ, ইহাকেই পাইয়াছিল, ইহার জীবনটা লওয়াই খোদা তা'আলার মকছুদ ছিল, আল্লাহ্ তা'আলার এই রকম করা ভাল হয় নাই, বা উচিত ছিল না, এই রকম যুল্‌ম কেহ করে না ইত্যাদি; (আরও অনেক বেহুদা কথা যাহা সাধারণতঃ মূর্খেরা শোকে বিহ্বল হইয়া বলিয়া থাকে।)

খোদা বা রসূলের কোন হুকুমকে মন্দ জানা বা তাহাতে কোন প্রকার দোষ বাহির করা। কোন নবী বা ফিরিশ্‌তার উপর কোনরূপ দোষারোপ করা। কোন নবী বা ফিরিশ্‌তাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ মনে করা। কোন পীর বা বুযুর্গ সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় তিনি সব সময় আমাদের সকল অবস্থা জানেন। গণক কিংবা যাহার উপর জ্বিনের আছর হইয়াছে, তাহার নিকট গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা বা হাত ইত্যাদি দেখাইয়া ভাগ্য নির্ণয় করান এবং তাহাতে বিশ্বাস করা। কোন বুযুর্গের কালাম হইতে ফাল বাহির করিয়া উহাকে দৃঢ় সত্য মনে করা। কোন পীর বা অন্য কাহাকেও দূর হইতে ডাকিয়া মনে করা যে, তিনি আমার ডাক শুনিয়াছেন। কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাহাকেও লাভ-লোকসানের অধিকারী মনে করা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজের মকছুদ, টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি, রুযি-রোযগার, সন্তান ইত্যাদি চাওয়া। (কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য) কাহাকেও সেজ্‌দা করা, কাহারও নামে রোযা রাখা বা কাহারও নামে গরু ইত্যাদি কোন জানোয়ার ছাড়িয়া দেওয়া বা দরগাহে মান্নত মানা। কোন কবর বা দরগাহ্ বা পীর-বুযুর্গের ঘরের তওয়াফ করা (অর্থাৎ, চতুর্দিকে ঘোরা।) খোদা রসূলের হুকুমের উপর অন্য কাহারও হুকুমকে বা কোন দেশ-রেওয়াজ বা সামাজিক প্রথাকে (বা নিজের কোন পুরাতন অভ্যাসকে বা বাপ-দাদার কালের কোন দস্তুরকে) পছন্দ বা অবলম্বন করা। কাহারও সামনে সম্মানের জন্য (সালাম ইত্যাদি করিবার সময়) মাথা নোয়ান বা কাহারও সামনে মূর্তির মত খাড়া থাকা। কাহারও নামে কোন জানোয়ার যবাহ্ করা। উপরি দৃষ্টি বা জ্বিনের আছর ছাড়াইবার জন্য তাহাদের ভেট (নযরানা) দেওয়া, ছাগল বা কোন জানোয়ার যবাহ্ করা, কাহারও দোহাই দেওয়া। কা'বা শরীফের মত অন্য কোন জায়গার আদর তা'যীম করা। কাহারও নামে ছেলে-মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা ও বালি, বোলাক ইত্যাদি পরান। কাহারও নামে বাজুতে পয়সা বা গলায় সূতা বাঁধা। নব বরের মাথায় সহরা অর্থাৎ ফুলের মালা বাঁধা, ইহা হিন্দুদের রস্‌ম। টিকি রাখা (কাহারও নামে চুল রাখা), কাহারও নামে ফকীর বানান। আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী ইঁত্যাদি নাম রাখা। (এরূপ এক কড়ি, বদন, পবন, গমন ইত্যাদি নাম রাখা) কোন প্রাণীর নাম কোন বুযুর্গের নাম অনুযায়ী রাখিয়া তাহার তা'যীম করা। পৃথিবীতে যাহাকিছু হয়, নক্ষত্রের তাছীরে হয় বলিয়া মনে করা। ভাল বা মন্দ দিন তারিখ জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা[১] কোন মাস বা তারিখকে মন্‌হুছ (খারাব) মনে করা। কোন বুযুর্গের নাম ওযীফার মত জপা। এইরূপ বলা, যদি খোদা রসূল চায়, তবে এই কাজ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, খোদার সঙ্গে রসূলকেও শামেল

টিকা

১ যেমন প্রথা আছে যে, হাত খুজলাইলে হাতে টাকা আসিবে। হাঁচি দিলে কার্য সিদ্ধি হইবে না। ডান চোখ লাফাইলে ভাল হইবে, বাম চোখ লাফাইলে বলে, বিপদ আসিবে।

করা। কাহারও নামের বা মাথার কসম খাওয়া। ছবি রাখা বিশেষতঃ বুযুর্গের ছবি বরকতের জন্য রাখা এবং উহার তা'যীম করা।

বেদ্‌আৎ—কুপ্রথা

(কোন বুযুর্গের) দরগায় ধুমধামের সহিত মেলা বা ওরস করা, বাতি জ্বালান, মেয়েলোকের তথায় যাওয়া, চাদর দেওয়া, কবর পাকা করা, কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁহার কবরকে অতিরিক্ত তা'যীম করা, কবর বা তা'যিয়া চুম্বন করা, কবরের মাটি শরীরে মাখা, তা'যীমের জন্য কবরের চারিদিকে তওয়াফ (ঘোরা) করা, কবর সেজ্‌দা করা, কবরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া, মিঠাই ইত্যাদি দরগাহে মানা বা দেওয়া, তা'যিয়া নিশান ইত্যাদি রাখা, উহার উপর হালুয়া বাতাশা প্রভৃতি রাখা, উহাকে সালাম করা। কোন জিনিসকে অচ্ছ্যুৎ মনে করা। মোহাররম মাসে পান না খাওয়া, মেহেন্দি, মিসি না লাগান, (নিরামিষ খাওয়া) স্বামীর কাছে না যাওয়া, লাল কাপড় না পরা ইত্যাদি। বিবি ফাতেমার নামে ফাতেহার উদ্দেশ্যে মাটির বরতনে খানা রাখাকে ছেহ্‌নক বলে, উহা হইতে পুরুষদিগকে খাইতে না দেওয়া। প্রকাশ থাকে যে, ইহা মেয়েদের জন্যও জায়েয নাই।

কেহ মারা গেলে তিজা, চল্লিশা জরুরী মনে করিয়া করা (অর্থাৎ, ৩ দিনের দিন বা ৪০ দিনের দিন মোল্লা মুন্সী বা যাহারা দাফন করিতে আসে, জরুরী মনে করিয়া তাহাদিগকে খাওয়ান বা বদনামীর ভয়ে ধুমধামের সহিত যেয়াফত করা।) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহকে দূষণীয় মনে করা। বিবাহের সময়, খাৎনার সময়, বিস্‌মিল্লাহ্‌র সবক্ব দেওয়ার সময়, কেহ মারা গেলে অসাধ্য সত্ত্বেও খান্দানী রসূমসমূহ বজায় রাখা (সামজিক প্রথাগুলি ঠিক রাখা)। বিশেষতঃ টাকা করয করিঁয়া নাচ, রং-তামাশা প্রভৃতি করান। হিন্দুদের কোন পূজা বা তেহার হুলি, দেওয়ালী—ইত্যাদিতে যোগদান করা। "আস্‌সালামু আলাইকুম" না বলিয়া তাহার পরিবর্তে আদাব (নমস্কার, প্রণিপাত ইত্যাদি) বলা বা কেবল হাত উঠাইয়া মাথা ঝুঁকান।[১] দেওর, ভাশুর, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচাত ভাই, ননদের স্বামী বা ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বাপ প্রভৃতির বা অন্য কোন না-মহরম[২] আত্মীয়ের সহিত দেখা দেওয়া। গান বাদ্য শোনা, নাচ দেখা বা তাহাদের গান-বাদ্যে বা নাচে সন্তুষ্ট হইয়া বখ্‌শিশ দেওয়া। নিজের বংশের গৌরব করা বা কোন বুযুর্গের খান্দানের হওয়া বা বুযুর্গের কাছে শুধু মুরীদ হওয়াকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা। কাহারও বংশের মধ্যে দোষ থাকিলে তাহা বাহির করিয়া নিন্দা করা। কোন জায়েয পেশাকে অপমানজনক মনে করা (যেমন, মাছ বিক্রি করা, মজুরী করা, জুতা সেলাই করা ইত্যাদি।) কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা। বিবাহ-শাদীতে বেহুদা খরচ করা এবং অন্যান্য যে-সব বেহুদা কাজ আছে তাহা করা। (যেমন পণ লওয়া, খরচ বাবদ লওয়া, ঘাট-সেলামী, আগবাড়ানী, আন্দর সেলামী, হাত

টিকা

১ যে সমস্ত কুসংস্কার হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে এরকম আরও অনেক কুসংস্কার মূর্খতাবশতঃ সমাজে ঢুকিয়াছে—যে দিন ধান বুনে সে দিন খৈ ভাজে না, যে হাঁড়িতে করিয়া তিল বুনে সে হাঁড়ি বাড়ীতে আনিলে মাটিতে রাখে না, কলাগাছ লাগাইবার সময় উপরের দিকে দেখে না, নারিকেল, সুপারী, পানগাছ লাগায় না ইত্যাদি।

২ শরীঅত মত যাহাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয তাহাদিগকে 'না-মহরম' বলে।

ধোয়ানী, চিনি-মুখী প্রভৃতি বেহুদা আদায় করা;) সুন্নত তরীকা ছাড়িয়া এতদ্দেশে যে-সব প্রথা প্রচলিত আছে তাহা পালন করা। নওশাকে শরীঅতের খেলাফ পোশাক পরান। বরের হাতে কাঙ্গন বাঁধা, মাথায় ছহ্‌রা বাঁধা।

বরের মেহেন্দী লাগান, আতশবাজী ফুটান ইত্যাদি কাজে অনর্থক টাকা অপব্যয় করা। বরকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া তাহার সামনে না-মহরম মেয়েলোকের আসা, এইরূপ পরপুরুষের সামনে মুখ দেখান বা অন্যান্য খেশ আত্মীয়দের আনিয়া বৌ দেখান আরও গর্হিত কর্ম। বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দুল্‌হাকে দেখা। বয়স্কা শালীদের সামনে আসা এবং হাসি-ঠাট্টা করা, চৌথী খোলান, যে ঘরে বর ও কনে শয়ন করে সেই ঘরের আশেপাশে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্তা শোনা বা উঁকি দিয়া দেখা এবং যদি কোন কথা জানিতে পারে, তবে অন্যকে জানাইয়া দেওয়া। লজ্জায় নামায পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া। বড় মানুষী দেখাইবার জন্য মহর বেশী নির্ধারণ করা। শোকে-দুঃখে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা বা বুক চাপড়াইয়া বিলাপ করা। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলা। যে-সব কাপড় মৃতের গায়ে লাগিয়াছে সে-সব নাপাক না হইলেও ধোয়া জরুরী মনে করা। যে-গৃহে লোক মারা গিয়াছে সে-গৃহে বৎসর খানেক বা কিছু কম-বেশী দিন না যাওয়া বা কোন খুশীর কাজ (যেমন, বিবাহ ইত্যাদি) না করা। নির্দিষ্ট তারিখে আবার শোককে তাজা করা। অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করা।

সাদাসিদা লেবাস-পোশাককে ঘৃণা করা। ঘরে জীব-জন্তুর ছবি লাগান, সোনা রূপার পানদান, সুরমাদান, বাসন, পেয়ালা ব্যবহার করা। শরীর দেখা যায় এইরূপ পাতলা কাপড় পরিধান করা। বাজনাদার জেওর পরিধান করা। পুরুষদের সভায় মেয়েদের যাওয়া বিশেষতঃ তাযিয়া, ওরস বা মেলা দেখিতে যাওয়া। স্ত্রীলোকদের এরূপ পোশাক পরা যাহাতে পুরুষের মত দেখা যায় এবং পুরুষদেরও এমন পোশাক পরা যাহাতে স্ত্রীলোকের মত দেখায়। শরীরে গুদানী দেওয়া[১] বিদেশে যাইবার সময় বা বিদেশ হইতে আসিয়া কোন না-মহরমের সঙ্গে মো'আনাকা করা। সন্তান জীবিত থাকার জন্য তাহার নাক কান ছিদ্র করা। পুত্র সন্তানকে বালা, ঘুগরা ইত্যাদি জেওর পরান বা রেশমী কাপড় পরান। ছেলেপেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আফিং বা নিশাদার জিনিস খাওয়ান। রোগের জন্য বাঘের বা হারাম জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়ান। এই রকম আরও অনেক বিষয় আছে, কোনটি শির্‌ক ও কুফ্‌রমূলক, আর কোনটি বেদ্‌আত ও হারাম। চিন্তা করিলে বা কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে বেশী জানা যাইবে। নমুনা স্বরূপ এতটুকু বর্ণনা করিলাম।

কতিপয় বড় বড় গুনাহ্‌

খোদার সঙ্গে অপর কাহাকেও শরীক করা। অনর্থক খুন করা (মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা বা বান মারিয়া যে কাহাকেও মারা হয় তাহাতেও খুন করার গুনাহ্‌ হইবে। বন্ধ্যা রমণীর এমন টোট্‌কা করা যে, অমুকের সন্তান মরিয়া যাইবে এবং তাহার সন্তান পয়দা হইবে। ইহাও খুনের শামিল। মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া। যিনা (ব্যভিচার) করা। এতীমের মাল খাওয়া; যেমন অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া বসে এবং নাবালেগ ছেলেমেয়েদের অংশে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করে। মেয়েদের অংশ (হক) না দেওয়া, সামান্য কারণেই কোন স্ত্রীলোকের উপর যিনার

টিকা

১ শরীরে কোন জীবের ছবি বা নাম অঙ্কন করা।

তোহ্‌মত (দোষারোপ) দেওয়া। কাহারও উপর যুল্‌ম করা। অসাক্ষাতে কাহারও শেকায়েত করা। আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হইতে নিরাশ হইয়া যাওয়া। ওয়াদা করিয়া তাহা পুরা না করা, আমানতে খেয়ানত করা। খোদা তা'আলার কোন ফরয, যেমন—নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ ইত্যাদি ছাড়িয়া দেওয়া। কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, বিশেষতঃ মিথ্যা কসম খাওয়া। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও কসম খাওয়া বা এই রকম কসম খাওয়া যে, মরণকালে যেন কলেমা নছীব না হয়, বা ঈমানের সাথে মউত না হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও সেজ্‌দা করা। বিনা ওযরে নামায ক্বাযা করা। কোন মুসলমানকে বেঈমান কাফের বা খোদার দুশমন বলা বা এই রকম বলা যে, তাহার উপর খোদার লা'নত হউক, খোদার গযব পড়ুক। কাহারও নিন্দাবাদ, গীবৎ শেকায়েত শোনা, চুরি করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, ধান-চাউলের দর বাড়িলে মনে মনে খুশী হওয়া, দাম ঠিক করিয়া আবার পরে কম নেওয়া (যেমন সাধারণতঃ নামের জন্য বড় লোকেরা গরীব লোকদের সঙ্গে করিয়া থাকে।) না-মহরমের কাছে নির্জনে একাকী বসা। জুয়া খেলা। কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজ পছন্দ করা। খাবার কোন জিনিসকে মন্দ বলা। নাচ দেখা। গান-বাদ্য শোনা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নছীহত না করা। হাসি-তামশা করিয়া কাহাকেও লজ্জা এবং অপমানিত করা। পরের দোষ দেখা ইত্যাদি কবীরা (বড়) গুনাহ্‌।

গুনাহ্‌র কারণে পার্থিব ক্ষতি

গুনাহ্‌র কারণে এল্‌ম হইতে মাহ্‌রূম থাকিতে হয়। রুজিতে বরকত হয় না, এবাদতে মন বসে না, নেক লোকের সংসর্গ ভালবাসে না। অনেক সময় কাজে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন আসিয়া দাঁড়ায়, অন্তর পরিষ্কার থাকে না ময়লা পড়িয়া যায়, মনের সাহস কমিয়া যায়, এমন কি, অনেক সময় মনের দুর্বলতা হেতু শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। (মনে স্ফূর্তি থাকে না)। নেককাজ ও এবাদত বন্দেগী হইতে মাহ্‌রূম থাকে। আয়ু কমিয়া যায়। তওবা করার তওফীক হয় না। গুনাহ্‌ করিতে করিতে শেষে গুনাহ্‌র কাজের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না, (বরং ভাল বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এরূপ হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা); আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। একজনের গুনাহ্‌র দরুন অন্যান্য লোক, এমন কি, অন্যান্য জীব-জন্তুরও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। পরে তাহাদের বদদো'আ ও লা'নতে (অভিশাপে) পড়িতে হয়। জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ হইতে তাহার প্রতি লা'নত হইতে থাকে। ফিশ্‌তাগণের দো'আ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। দেশে শস্য-ফসলাদির উৎপন্ন কম হয়। লজ্জা-শরম কম হইয়া যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা যে কত বড় এবং ক্ষমতাশালী সে খেয়াল্‌ তাহার অন্তরে থাকে না। আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামত ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। নানারূপ বিপদ-আপদ বালামুছীবতে জড়াইয়া পড়ে। শয়তান তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে। দেল পেরেশান থাকে। মৃত্যুকালে মুখ দিয়া কলেমা বাহির হয় না। খোদার রহ্‌মত হইতে নিরাশ হইয়া যায়। পরিশেষে বিনা তওবায় মারা যায়।

নেক কাজে পার্থিব লাভ

সর্বদা নেক কাজে মশগুল থাকিলে রিযিক বৃদ্ধি হয়, সকল কাজে বর্‌কত হইয়া থাকে। মনের অশান্তি ও কষ্ট দূর হয়, মনের আশা সহজে পুরা হয়, জীবনে শান্তি লাভ হয়, রীতিমত বৃষ্টিপাত

হয়, সকল প্রকার বালা-মুছীবত, বিপদ-আপদ দূর হয়, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবান এবং সহায় হন। তাহার হৃদয় মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাকে আদেশ করেন। মান মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, সকলে তাহাকে ভালবাসে। কোরআন শরীফ তাহার রোগ আরোগ্যের উছীলা হয়, টাকা-পয়সার দিক দিয়া কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহা অপেক্ষা আরও ভাল জিনিস পাওয়া যায়। দিন দিন আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত তাহার জন্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ধন-দৌলত বৃদ্ধি পায়, মনে শান্তি বজায় থাকে, তাহার উছীলায় পরবর্তী বংশধরদের অনেক উপকার হয়। জীবিত অবস্থায়, স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় গায়েবী বশারত (খোশ্‌খবরী) পায়। মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তা খোশ্‌খবরী শোনায় এবং ধন্যবাদ দেয়। আয়ু বৃদ্ধি হয়, দরিদ্রতা এবং অনাহারজনিত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়, অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয়, আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ দূর হয়।

হে খোদা! নিজ রহমতে আমাদের যাবতীয় গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখুন এবং আপনার সন্তুষ্টির পথে সকলকে চলিবার তওফীক দান করুন।

ওযূর মাসায়েল

ওযূর তরতীব ঃ

(ওযূ আরম্ভকালে প্রথমে মনকে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করিবে। চিন্তা করিয়া স্থির করিবে যে, কেন ওযূ করিতেছ যেমন হয়ত নামায পড়িবার জন্য ওযূ করিবে, তখন চিন্তা করিবে, নামায পড়া হইল আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়া। আল্লাহ্‌র দরবার পাক, সে দরবারে বিনা ওযূতে যাওয়া যায় না। তাই আমি নামায পড়িবার জন্য অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হইবার নিমিত্ত ওযূ করিতেছি। এইরূপে যদি কোরআন শরীফ পড়িবার জন্য ওযূ কর, তখন একাগ্র মনে চিন্তা করিবে যে, আমি আল্লাহ্‌র পাক কালাম কোরআন শরীফ পড়িবার জন্য ওযূ করিতেছি।)

১। **মাসআলা ঃ** ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় বসিবে—যেন ওযূর পানির ছিঁটা নিজের উপর আসিতে না পারে। —মুনিয়া

২। **মাসআলা ঃ** বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া ওযূ শুরু করিবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

৩। **মাসআলা ঃ** সর্বপ্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

৪, ৫, ৬। **মাসআলা ঃ** তারপর তিনবার কুল্লি করিবে এবং মিসওয়াক করিবে, যদি মিস্‌ওয়াক না থাকে, তবে মোটা কাপড় বা হাতের আঙ্গুল বা অন্য কিছু দ্বারা দাঁতগুলিকে বেশ পরিষ্কার করিবে। যদি রোযা না হয়, তবে গরগরা করিয়া ভালরূপে সমস্ত মুখগহ্বরে পানি পৌঁছাইবে। রোযা অবস্থায় গরগরা করিবে না। কেননা, হয়ত কিছু পানি হল্‌কূমের মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে। —আলমগীরী

৭। **মাসআলা ঃ** তারপর তিনবার নাকে পানি দিবে। বাম হাত দিয়া নাক ছাফ করিবে। রোযা অবস্থায় নাকের ভিতরে নরম অংশের উপর পানি পৌঁছাইবে না[১]। —মুঃ, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া

৮। **মাসআলা ঃ** তারপর তিনবার মাথার চুলের গোড়া হইতে থুত্‌নি পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হইতে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখ ভাল করিয়া উভয় হাত দিয়া ডলিয়া মলিয়া

টিকা

১ বাম হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নাকের ভিতর পরিষ্কার করিবে।

ধুইবে—যেন সব জায়গায় পানি পৌঁছে। উভয় ভ্রূর নীচেও খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে যেন কোন স্থান শুক্‌না না থাকে। —মারাকিউল ফালাহ

৯। **মাসআলা ঃ** অতঃপর ডান হাতের কনুইসহ ভাল করিয়া তিন বার ধুইবে। তারপর বাম হাতও ঐরূপে কনুইসহ ধুইবে। এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খেলাল করিবে। হাতের আংটি, চুড়ি ইত্যাদি নাড়িয়া চাড়িয়া ভালমতে পানি পৌঁছাইবে যেন একটি পশমও শুষ্ক না থাকে। —কবীরী

১০। **মাসআলা ঃ** তারপর সমস্ত মাথা একবার মছহে করিবে। শাহাদাত আঙ্গুল দিয়া কানের ভিতর দিক এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়া বাহিরের দিক মছহে করিবে এবং হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক দিয়া ঘাড় মছহে করিবে, কিন্তু গলা মছহে করিবে না। কেননা গলা মছহে করা ভাল নহে; বরং নিষেধ আছে। কান মছহে করিবার জন্য নূতন পানি লইবার প্রয়োজন নাই, মাথা মছহে করার জন্য ভিজান হাত দ্বারাই মছহে করিবে। —কবীরী, মুনিয়া

১১। **মাসআলা ঃ** তারপর তিনবার টাখ্‌না (ছোট গিরা) সহ উভয় পা ধুইবে। প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা ভাল করিয়া ডলিয়া মলিয়া ধুইবে। পায়ের তলা এবং গোড়ালির দিকে খুব খেয়াল রাখিবে, যেন কোন অংশ শুক্‌না থাকিয়া না যায়। বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী নীচের দিক হইতে প্রবেশ করাইয়া পায়ের অঙ্গুলীগুলি খেলাল করিবে। ডান পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী হইতে শুরু করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে গিয়া শেষ করিবে। এই হইল ওযূ করিবার নিয়ম।

১২। **মাসআলা ঃ** কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যে কতিপয় কাজ এমন আছে, যাহা ছুটিয়া গেলে বা তাহার কিছু বাকী থাকিলে ওযূ আদৌ হয় না; পূর্বে যেমন বে-ওযূ ছিল এখনও সেই রকম বে-ওযূই রহিল। এই রকম কাজগুলিকে "ফরয" বলে। আর কতিপয় কাজ এমন আছে, যাহা ছুটিয়া গেলে ওযূ হইয়া যায় বটে, কিন্তু করিলে সওয়াব মিলে, তাহা করার জন্য তাকীদও আছ। এমন কি, যদি কেহ অধিকাংশ সময়ে ছাড়িয়া দেয়, তবে সে গোনাহ্‌গার হয়। এই সব কাজকে "সুন্নত" বলে। আর যে-সব কাজ করিলে সওয়াব মিলে, অন্যথায় গোনাহ্ হয় না এবং তৎপ্রতি শতীঅতের কোনও তাকীদ নাই, এইরূপ কাজগুলিকে "মোস্তাহাব" বলে।

—কবীরী, রদ্দুল মোহ্‌তার

১৩। **মাসআলা ঃ ওযূর ফরয ঃ** ওযূর ফরয শুধু চারিটি কাজ—১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া ২। কনুইসহ এক একবার উভয় হাত ধোয়া ৩। মাথার চারি ভাগের এক ভাগ একবার মছ্‌হে করা ৪। টাখ্‌নাসহ উভয় পা একবার ধোয়া। ইহার মধ্যে যদি একটি কাজও ছুটিয়া যায় বা চুল পরিমাণ জায়গাও শুক্‌না থাকে, তবে ওযূ হইবে না। —মাজমাউল আনহার

১৪। **মাসআলা ঃ ওযূর সুন্নত ঃ** ওযূর সুন্নত দশটি। ১। বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আরম্ভ করা। ২। কব্জীসহ দুই হাত তিন তিনবার ধোয়া ৩। কুল্লি করা ৪। নাকে পানি দেওয়া ৫। মেসওয়াক করা ৬। সমস্ত মাথা একবার মছ্‌হে করা ৭। প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিনবার করিয়া ধোয়া ৮। কান মছ্‌হে করা। ৯-১০। হাত ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা। এই সুন্নত এবং ফরযগুলি ব্যতীত অন্য যে কাজগুলি আছে তাহা মোস্তাহাব। —মারাকিউল ফালাহ্

১৫। **মাসআলা ঃ** যে চারিটি অঙ্গ ধোয়া ফরয সেইগুলি ধোয়া হইয়া গেলে ওযূ হইয়া যাইবে। ইচ্ছা করিয়া ধুইয়া থাকুক বা অনিচ্ছায় ধুইয়া থাকুক, নিয়ত করিয়া থাকুক বা না করিয়া থাকুক। যেমন, গোছলের সময় ওযূ না করিয়া সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিল বা পুকুরের মধ্যে

পড়িয়া গেল বা বৃষ্টিতে ভিজিল, ইহাতে যদি এই চারিটি অঙ্গ পূর্ণরূপে ধোয়া হইয়া যায়, তবে ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু নিয়ত না থাকার দরুন ওযূর সওয়াব পাইবে না। —মুন্‌ইয়াহ

১৬। মাসআলা ঃ উপরে লিখিত তর্‌তীব অনুযায়ী ওযূ করাই সুন্নত। কিন্তু যদি কেহ উহার ব্যতিক্রম করে, যেমন, প্রথমে পা ধুইল, তারপর মাথা মছহে করিল তারপর হাত বা অন্য কোন অঙ্গ আগে পরে ধুইল, তবুও ওযূ শুদ্ধ হইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। ইহাতে গোনাহ্‌ হওয়ারও আশঙ্কা আছে; অর্থাৎ, যদি এই রকম উল্টা ওযূ করার অভ্যাস করে, তবে গোনাহ্‌ হইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১৭। মাসআলা ঃ এইরূপ যদি বাম পা বা বাম হাত আগে ধোয়, তবুও ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু মোস্তাহাবের খেলাফ হইবে। —মারাকী

১৮। মাসআলা ঃ এক অঙ্গ ধুইয়া অন্য অঙ্গ ধুইতে এত দেরী করিবে না যে, প্রথম অঙ্গ শুকাইয়া যায়। এরূপ দেরী করিলে অবশ্য ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। —আলমগীরী

১৯। মাসআলা ঃ প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় হাত দিয়া ঘষিয়া মাজিয়া ধোয়াও সুন্নত, যেন কোন জায়গা শুক্‌না না থাকে (শীতকালে মলিয়া ধোয়ার বেশী আবশ্যক; কেননা, তখন শুকনা থাকিয়া যাইবার বেশী আশঙ্কা।) —মারাকী

২০। মাসআলা ঃ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই ওযূ করিয়া নামাযের আয়োজন করা এবং নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল এবং মোস্তাহাব। —মারাকী

২১। মাসআলা ঃ একান্ত ওযর না হইলে নিজের হাতেই ওযূ করিবে, অন্যের দ্বারা পানি ঢালাইবে না। ওযূর সময় অনাবশ্যক দুন্‌ইয়াবী কথা বলিবে না; বরং প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় বিসমিল্লাহ্‌ এবং কলেমা পড়িবে। পানি যতই বেশী থাকুক না কেন, এমন কি নদীতে ওযূ করিলেও জরুরতের বেশী পানি খরচ করিবে না; অবশ্য এত কমও খরচ করিবে না যে, অঙ্গগুলি ভালমত ধুইতে কষ্ট হয়। কোন অঙ্গ তিনবারের বেশীও ধুইবে না। মুখ ধুইবার সময় পানি বেশী জোরে মুখে মারিবে না, ফুঁক মারিয়া পানি উড়াইবে না, মুখ এবং চোখ অতি জোরের সহিত বন্ধ করিবে না। কেননা, এইসব কাজ মাকরূহ্‌ এবং নিষেধ। যদি মুখ এবং চোখ এরকম জোরে বন্ধ করিয়া রাখা হয় যাহাতে চোখের পলক বা ঠোঁটের কিছু অংশ ধোয়া হইল না, বা চোখের কোণায় পানি পৌঁছাইল না, তবে ওযূই হইবে না। —কবীরী

২২। মাসআলা ঃ আংটি, চুড়ি, বালা যদি এরকম ঢিলা হয় যে, সহজেই উহার নীচে পানি পৌঁছিতে পারে, তবুও সেগুলি নাড়াইয়া ভালরূপে খেয়াল করিয়া উহার নীচে পানি পৌঁছান মোস্তাহাব। আর যদি ঢিলা না হয় এবং পানি না পৌঁছিবার আশঙ্কা থাকে, তবে সেগুলিকে ভালরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া নীচে পানি পৌঁছান ওয়াজিব। নাকের নথ চুঙ্গিরও এই হুকুম যে, যদি ছিদ্র ঢিলা হয়, তবে নাড়িয়া পানি পৌঁছান মোস্তাহাব; আর যদি ছিদ্র আঁটা হয়, তবে মুখ ধুইবার সময় নথ, বালি ভালরূপে ঘুরাইয়া পানি পৌঁছান ওয়াজিব।

—কবীরী

২৩। মাসআলা ঃ নখের ভিতরে আটা জমিয়া (অথবা কোন স্থানে চুন ইত্যাদি) শুকাইয়া থাকিলে ওযূর সময় যদি তাহার নীচে পানি না যায়, তবে ওযূ হইবে না, যখন মনে আসে এবং আটা দেখে, তখন আটা (ও চুন ইত্যাদি) ছাড়াইয়া তথায় পানি ঢালিয়া দিবে (সম্পূর্ণ ওযূ

দোহ্‌রাইবে না)। পানি ঢালার পূর্বে নামায পড়িয়া থাকিলে সেই নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। —গুন্‌ইয়া পৃঃ ৪৬

২৪। **মাসআলা ঃ** কপালে ও মাথায় আফ্‌শান (এবং নখে নখ-পালিশ) ব্যবহার করিলে তাহার আটা উঠাইয়া ধুইতে হইবে, নতুবা ওযূ বা গোসল কিছুই হইবে না।

২৫। **মাসআলা ঃ** ওযূ শেষে একবার সূরা-ক্বদর এবং এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্‌! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর, তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত কর, রোজ হাশরে যাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না। —কবীরী

২৬। **মাসআলা ঃ** ওযূ করার পর দুই রাকা'আত 'তাহিয়্যাতুল ওযূ' নামায পড়া ভাল। হাদীস শরীফে ইহার অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। —কবীরী

২৭। **মাসআলা ঃ** এক ওয়াক্তের নামাযের জন্য ওযূ করিয়াছে, সে ওযূ এখনও টুটে নাই, ইতিমধ্যে অন্য নামাযের ওয়াক্ত হইল, এখন সেই ওযূ দিয়াই এই নামায পড়িতে পারে। কিন্তু নূতন ওযূ করিলে সওয়াব অনেক বেশী পাইবে।

২৮। **মাসআলা ঃ**একবার ওযূ করিয়াছে এখনও সেই ওযূ টুটে নাই, অন্য এবাদতও সেই ওযূর দ্বারা করে নাই, এখন পুনঃ ওযূ করা মাকরূহ্‌ এবং নিষেধ। সুতরাং গোসলের সময় ওযূ করিয়া থাকিলে সেই ওযূর দ্বারাই নামায পড়িবে; সে ওযূ না টুটা পর্যন্ত পুনঃ ওযূ করিবে না। যদি দুই রাকা'আত নামাযও ঐ ওযূর দ্বারা পড়িয়া থাকে, তবে আবার ওযূ করিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং ওযূ করিলে বেশী সওয়াব পাইবে। —মারাকী

২৯। **মাসআলা ঃ** হাত পা কাটিয়া গিয়াছে এবং সেখানে ঔষধ লাগাইয়াছে ঔষধ ছাড়াইয়া ওযূ করিলে ক্ষতি হয়। এখন যদি সেই ঔষধ না ছাড়াইয়া শুধু উপর দিয়া পানি ঢালিয়া লয়, তবুও ওযূ হইয়া যাইবে। —ছগীরী

৩০। **মাসআলা ঃ** ওযূ করিবার সময় হয়ত পায়ের গোড়ালি বা অন্য কোন জায়গায় পানি পৌঁছে নাই, ওযূ করিবার পর নযর পড়িয়াছে; এখন সেই জায়গা শুধু হাতে ডলিয়া দিলে ওযূ হইবে না, পানি ঢালিয়া দিতে হইবে।

৩১। **মাসআলা ঃ** শরীরে ফোঁড়া বা অন্য কোন রোগ এই রকম আছে যে, পানি লাগিলে ক্ষতি হয়, তবে যেখানে পানি লাগিলে ক্ষতি হয়, সেখানে পানি না লাগাইয়া শুধু ভিজা হাত দিয়া মুছিয়া লইতে পারে (এইরূপ মুছিয়া লওয়াকে 'মছ্‌হে' বলে)। আর যদি শুধু মুছিয়া লইলেও ক্ষতি হয়, তবে সে জায়গাটুকু একেবারে ছাড়িয়াও দিতে পারে। —মারাকী

৩২। **মাসআলা ঃ** যখমের পট্টি খুলিয়া যখমের উপরও মছ্‌হে করিলে যদি ক্ষতি হয়, বা পট্টি খুলিতে খুব কষ্ট হয়, তবে পট্টির উপরও মছ্‌হে করা চলে। এমন অবস্থা না হইলে পট্টির উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না। (যদিও ধোয়া না হয়।) —শরহে বেকায়া-১

৩৩। **মাসআলা ঃ** সম্পূর্ণ পট্টির নীচে যদি যখম না থাকে, তবে যদি পট্টি খুলিয়া যখমের জায়গা ছাড়িয়া অন্য জায়গা ধুইতে পারে, তবে ধুইতে হইবে। আর যদি পট্টি খুলিতে না

পারা যায়, তবে যখমের জায়গায় এবং যে জায়গায় যখম নাই সে জায়গাও মছ্‌হে করিয়া লইবে। —কবীরী

৩৪। **মাসআলা ঃ** হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে বাঁশের চটা দিয়া যে তেকাঠিয়া বাঁধে তাহার হুকুমও পট্টিরই মত যতদিন তেকাঠি খুলিতে না পারে, তেকাঠির উপরই মছ্‌হে করিয়া লইবে এবং সিঙ্গার উপর পট্টিরও এই হুকুম, যদি যখমের উপর মছ্‌হে করিতে না পারে, তবে পট্টি খুলিয়া কাপড়ের ব্যাণ্ডিজের উপর মছ্‌হে করিবে। আর যদি খুলিবার ও বাঁধিবার লোক না পাওয়া যায়, তবে পট্টির উপরই মছ্‌হে করিবে। —কবীরী

৩৫। **মাসআলা ঃ** মছ্‌হে করিতে হইলে সমস্ত পট্টির উপর মছ্‌হে করা ভাল, কিন্তু অর্ধেকের বেশীর ভাগ মছ্‌হে করিলেও ওযূ হইয়া যাইবে। আর যদি সমান অর্ধেক বা কম অর্ধেক করে, তবে ওযূ আদৌ হইবে না। —গুনইয়া

৩৬। **মাসআলা ঃ** হঠাৎ পট্টি পড়িয়া গেল, এখনও যখম ভাল হয় নাই, তবে পট্টিই বাঁধিয়া লইবে, আর পূর্ব্বের মছ্‌হে বাকী থাকিবে। আবার মছ্‌হে করিতে হইবে না। যদি যখম ভাল হইয়া থাকে আর পট্টি বাঁধার দরকার না থাকে, তবে মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, নূতন ওযূ না করিয়া শুধু ঐ স্থানটুকু ধুইয়াও নামায পড়িতে পারে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১-১১ নং (বেহেশ্‌তী গওহর হইতে)

১। **মাসআলা ঃ** পুরুষগণ ওযূর সময় তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়ার পর দাড়ি খেলাল করিবে। অর্থাৎ, ভিজা হাতের আঙ্গুল দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাড়ি ভিজাইবে। তিনবারের বেশী খেলাল করিবে না। —দোর্‌রে মুখতার

২। **মাসআলা ঃ** ওযূর সময় দাড়ি এবং কানের মধ্যবর্তী স্থানটুকু ধোয়া ফরয, সেখানে দাড়ি থাকুক বা না থাকুক । —শরহে তানবীরুল আবছার

৩। **মাসআলা ঃ** ওযূর মধ্যে থুতনী ধৌত করা ফরয, যদিও তাহার উপর দাড়ি না থাকুক বা দাড়ি থাকুক। —শরহে তানবীরুল আবছার

৪। **মাসআলা ঃ** মুখ বন্ধ করিলে ঠোঁটের যে অংশ স্বভাবিকভাবে বাহিরে দেখা যায়, তাহাও ওযূর মধ্যে ধোয়া ফরয। —শামী

৫। **মাসআলা ঃ** দাড়ি, মোচ বা ভ্রূ ঘন হওয়ার দরুন ভিতরকার চামড়া দেখা না গেলে, উহার নীচের চামড়া ধোয়া ফরয নহে; বরং ঐ দাড়িকেই চামড়ার পরিবর্তে ধরিতে হইবে এবং দাড়ির উপর দিয়া পানি বহাইয়া দিলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** দাড়ি, মোচ ও ভ্রূ যদি এত হালকা হয় যে, নীচের চামড়া দেখা যায়, তবে মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাড়ি ধোয়াই ফরয্ উহার বাহিরের দাড়ি ধোয়া ফরয নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও মলদ্বারের ভিতরের অংশ দ্বার হইতে বাহির হইয়া আসে (ইহা এক প্রকার রোগ বিশেষ), তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —শামী। চাই সে অংশ পুনরায় নিজে নিজেই ভিতরে প্রবেশ করুক কিংবা হাত বা কাপড়ের সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করান হউক।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি বিনা উত্তেজনায় (যেমন ভারী কোন বোঝা উঠাইলে বা উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেলে তাহাতে) মনি বাহির হয়, এমতাবস্থায় গোসল ফরয হইবে না বটে, কিন্তু ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কাযীখান

৯। **মাসআলা ঃ** (বেহুশ বা পাগল হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু) যদি মস্তিষ্ক সামান্য পরিমাণে বিকৃত হয় এবং তাহাতে বেহুশ বা পাগল না হয়, তবে ওযূ টুটিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে তন্দ্রা অবস্থায় উচ্চ হাসিলে ওযূ যাইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায ও তেলাওয়াতের সজ্‌দার সময় উচ্চ হাস্য করিলে বালেগ ব্যক্তিরও ওযূ নষ্ট হইবে না, না-বালেগ ব্যক্তিরও না।—মুনিয়া

ওযূ নষ্ট হইবার কারণ

১। **মাসআলা ঃ** মলমূত্র বাহির হইলে এবং পায়খানার রাস্তা দিয়া বাতাস বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যায়, আর যদি পেশাবের রাস্তা দিয়া কখনও বাতাস বাহির হয়, যেমন কোন কোন রোগের কারণে বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে ওযূ টুটে না। আর যদি কোন পোকা বা পাথর বাহির হয় (তা চাই পায়খানার রাস্তা দিয়া বাহির হউক বা পেশাবের রাস্তা দিয়া) তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কবীরী

২। **মাসআলা ঃ** যখম বা কান হইতে পোকা বাহির হইলে ওযূ টুটে না। যখম হইতে কিছু গোশ্‌ত কাটিয়া পড়িয়া গেলে রক্ত বাহির না হইলে, তাহাতে ওযূ টুটে না।

৩। **মাসআলা ঃ**সিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিলে, বা নাক দিয়া রক্ত আসিলে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থান বা কোন ফোঁড়া-বাঘি হইতে রক্ত পুঁজ বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু রক্ত যদি যখমের মধ্যেই থাকে, নির্গত স্থান হইতে বহিয়া না যায়,তবে ওযূ টুটিবে না। সুতরাং যদি হাতে সূচ বিদ্ধ হইয়া রক্ত বাহির হয় এবং এদিক ওদিক বহিয়া না যায়, তবে ওযূ যাইবে না। কিন্তু যদি এক বিন্দুও এদিক ওদিক গড়াইয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —গুনইয়া

৪। **মাসআলা ঃ** নাক ছাফ করিবার সময় যদি জমাট বাঁধা রক্ত বাহির হয় তবে তাহাতে ওযূ যাইবে না। কেননা, পাতলা তরল রক্ত বাহির হইয়া বহিয়া গেলে ওযূ টুটিয়া যায়। সুতরাং যদি নাকে আঙ্গুল দিলে তাহাতে রক্তের দাগ দেখা যায়, কিন্তু সে রক্ত বাহিয়া না আসে, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে না। —গুনইয়া

৫। **মাসআলা ঃ** চোখে কোন দানা ছিল, তাহা ভাংগিয়া গিয়া পানি বাহিয়া গিয়াছে, কিন্তু চোখের ভিতরেই রহিয়াছে, বাহিরে আসে নাই, তাহাতে ওযূ যাইবে না; কিন্তু বাহিরে আসিয়া থাকিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। এরূপ যদি কানের মধ্যে কোন দানা থাকে আর পুঁজ বা রক্ত বাহির হয়, তবে দেখিতে হইবে যে, রক্ত বা পুঁজ যদি গোসলের সময় যে-পর্যন্ত ধোয়া ফরয সে পর্যন্ত না আসিয়া থাকে, তবে ওযূ যায় নাই, আর যদি সে পর্যন্ত আসিয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া গিয়াছে। —গুনইয়া

৬। **মাসআলা** ফোঁড়া বা ফোস্কার উপরের চামড়া উঠাইয়া ফেলিলে যদি ভিতরে রক্ত বা পুঁজ দেখা যায় কিন্তু বাহিয়া বাহিরে না আসে, তবে ওযূ যায় না, বাহিরে বাহিয়া আসিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —গুনইয়া

৭। **মাসআলা ঃ** ফোঁড়া ইত্যাদির যখম খুব গভীর হইলেও যে-পর্যন্ত রক্ত বা পুঁজ মুখের বাহিরে না আসে সে পর্যন্ত ওযূ যায় না।

৮। **মাসআলা ঃ** ফোঁড়া বা বাঘির রক্ত নিজে বাহির হয় নাই, যদি টিপিয়া বাহির করা হইয়া থাকে এবং যখমের বাহিরে বাহিয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে।

৯। মাসআলা ঃ কাহারও যখম হইতে একটু একটু করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে আর সে তাহার উপর মাটি ছড়াইয়া দিতেছে বা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে যাহাতে রক্ত বাহিয়া এদিকে ওদিকে না যাইতে পারে, তবে এখন তাহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, যদি সে না মুছিত, তবে রক্ত বাহিয়া যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িত কি না যদি ছড়াইয়া পড়িত বলিয়া বোধ হয়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে, যদি এরকম বিশ্বাস হয় যে, না মুছিলেও রক্ত এত কম ছিল যে, এদিকে ওদিকে ছড়াইত না, তবে ওযূ যাইবে না। —কবীরী

১০। মাসআলা ঃ থুথুর সঙ্গে রক্ত দেখা গেলে যদি উহা নেহায়েত কম হয় বর্ণ সাদা বা হলদে রঙ্গের মত হয়, তবে ওযূ যাইবে না; আর যদি রক্ত বেশী হয় এবং লাল রঙ্গের মতন হয়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কবীরী

১১। মাসআলা ঃ দাঁত দ্বারা কোন জিনিস চিবাইতে সেই জিনিসের উপর রক্তের দাগ দেখা গেল, কিন্তু থুথুর সঙ্গে আদৌ রক্তের রং দেখা গেল না ইহাতে ওযূ যাইবে না।

১২। মাসআলা ঃ জোঁক লাগাইলে যদি উহা এত পরিমাণ রক্ত পান করিয়া থাকে যে, জোঁকটাকে কাটিয়া ফেলিলে রক্ত বাহিয়া পড়িবে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। যদি সামান্য মাত্রায় পান করিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে না। মশা, মাছি বা ছারপোকায় যে রক্ত পান করিয়া থাকে, তাহাতে ওযূ যায় না। —গুনইয়া

১৩। মাসআলা ঃ যদি কানের মধ্যে বেদনা অনুভব হয় এবং পানি বাহির হয়, যদিও কোন ফোঁড়া ফুঁসি অনুভব না হয়, তবুও এরকম পানি নাপাক, উহা কানের ছিদ্রের বাহিরে এমন জায়গা পর্যন্ত আসিলে ওযূ নষ্ট হইবে যাহা ওযূর মধ্যে ধোয়া ফরয। যদি নাভিস্থান হইতে পানি বাহির হয় এবং বেদনাও অনুভব হয়, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে কিংবা যদি চক্ষু হইতে পানি বাহির হয় এবং বেদনাও হয়, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে, অন্যথায় শুধু চোখ দিয়া পানি বাহির হইলে ওযূ যাইবে না। —শরহে তানবীর-১

১৪। মাসআলা ঃ স্তন হইতে পানি বাহির হইলে যদি বেদনা অনুভব হয়, তবে পানি নাপাক এবং ওযূ যাইবে, আর যদি বেদনা অনুভব না হয়, তবে সে পানি নাপাক নয় এবং ওযূও যাইবে না। —গুইনয়া

১৫। মাসআলা ঃ বমিতে ভাত পানি বা পিত্ত বাহির হইলে যদি মুখ ভরিয়া আসিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে। মুখ ভরিয়া না আসিলে ওযূ টুটিবে না, (মুখ ভরিয়া আসার অর্থ, মুখের মধ্যে সামলাইয়া রাখা কষ্টকর হইয়া পড়ে এই পরিমাণ) মুখ ভরিয়া কফ বমি করিলে ওযূ যাইবে না। বমিতে প্রবহমান তরল রক্ত বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, তাহা মুখ ভরিয়া আসুক বা কম আসুক জমাট রক্ত মুখ ভরিয়া বাহির হইলে ওযূ নষ্ট হইবে, অন্যথায় ওযূ যাইবে না।

—কবীরী

১৬। মাসআলা ঃ অল্প অল্প করিয়া বমি হইলে যদি সমস্ত বমি একত্র করিলে এত পরিমাণ হয় যে, সেই সব একবারে হইলে মুখ ভরিয়া যাইত, তবে যদি একবারের উদ্বেগে সেই সব বমি হইয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। আর যদি প্রথমবারের উদ্বেগ সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়া বমন ভাব দূর হইয়া আবার উদ্বেগের সহিত সামান্য বমি হয় এবং দ্বিতীয় বারের উদ্বেগ থামিয়া গেলে তৃতীয় বার আবার নূতন উদ্বেগ হইয়া সামান্য বমি হইয়া থাকে, তবে এই সব যোগ করা হইবে না এবং ওযূও যাইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ শুইয়া শুইয়া সামান্য কিছু ঘুমাইলেও ওযূ টুটিয়া যাইবে, আর যদি কোন বেড়া বা দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া থাকে, তবে যদি নিদ্রা এত গাঢ় হইয়া থাকে যে, ঐ বেড়া বা দেওয়াল সেখানে না থাকিলে ঘুমের ঝোঁকে পড়িয়া যাইত, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ঘুমাইলে ওযূ যায় না, (কিন্তু কোন রোকন নিদ্রিতাবস্থায় আদায় করিলে তাহা দোহ্রাইতে হইবে) সজ্‌দা অবস্থায় (বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের) ঘুম আসিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৮। মাসআলা ঃ নামাযের বাহিরে কোন বেড়া বা দেওয়ালে হেলান না দিয়া চুতড় দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়া ঘুমাইলে তাহাতে ওযূ যাইবে না। —কবীরী

১৯। মাসআলা ঃ বসিয়া বসিয়া ঘুমের এমন তন্দ্রা আসিয়াছে যে, পড়িয়া গিয়াছে, তবে যদি পড়িবা মাত্রই সজাগ হইয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে না। আর যদি কিছুমাত্রও বিলম্বে জাগিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে। আর যদি শুধু বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকে, না পড়ে তবে ওযূ যাইবে না। —শামী

২০। মাসআলা ঃ সামান্য সময়ের জন্যও বেহুশ বা পাগল হইয়া গেলে ওযূ যাইবে। যদি তামাক ইত্যাদি কোন নেশার জিনিস খাইয়া এরকম অবস্থা হইয়া থাকে যে, ভালমতে হাঁটিতে পারে না, পা এদিক ওদিক চলিয়া যায়, তবে তাহাতেও ওযূ যাইবে। —দুর্‌রুল মোখ্‌তার

২১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে এরকমভাবে হাসিলে, যাহাতে নিজেও শব্দ শুনিতে পায় এবং পার্শ্বস্থ লোকেও শব্দ শুনিতে পায় অর্থাৎ, হা হা (খল খল) করিয়া হাসিলে ওযূও যাইবে এবং নামাযও টুটিয়া যাইবে। আর যদি এরকমভাবে হাসে যাহাতে নিজেও আওয়ায শুনিয়া থাকে এবং অতি নিকটে যদি কেহ থাকে সেও শুনিতে পায় কিন্তু পার্শ্বস্থ লোকেরা সাধারণতঃ শুনিতে না পায়, তবে তাহাতে শুধু নামায টুটিবে ওযূ টুটিবে না। আর যদি হাসিতে আওয়ায মাত্রও না হইয়া থাকে, শুধু ঠোঁট ফাঁক হইয়া দাঁত বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহাতে ওযূও যাইবে না, নামাযও যাইবে না। নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে খল খল করিয়া হাসিলেও তাহার ওযূ যাইবে না। ঐরূপ তেলাওয়াতের সজ্‌দার মধ্যে কোন বালেগ ছেলে বা মেয়ে খল খল করিয়া হাসিলেও তাহার ওযূ যাইবে না; তবে ঐ সজ্‌দা ও নামায আদায় হইবে না, পুনরায় আদায় করিতে হইবে। —মুনিয়া

২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর মাসআলা ৫৯, পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬। মাসআলা ঃ ওযূর পর নখ কাটাইলে বা যখমের উপরের মরা চামড়া খুটিয়া ফেলিলে তাহাতে ওযূর কোন ব্যাঘাত হয় না—ওযূ দোহ্‌রাইতে হইবে না বা শুধু সেই জায়গাটুকু ধোয়ারও কোন হুকুম নাই। —শরহে তান্‌বীর

২৭। মাসআলা ঃ ওযূ করিয়া অন্য কাহারও ছতরে নযর পড়িলে বা নিজের ছতর খুলিয়া গেলে তাহাতে ওযূ যায় না। হাঁ, ঠেকা না হইলে অন্যের ছতর দেখা বা নিজের ছতর খোলা গোনাহ্‌র কাজ। ঐরূপে (অবরুদ্ধ গোসলখানায়) কাপড় খুলিয়া গোসল করিয়া ঐ কাপড় খোলা অবস্থায়ই যদি ওযূ করিয়া থাকে, তবে তাহাতেই ওযূ হইয়া যাইবে; পুনরায় ওযূ করিতে হইবে না। —কবীরী

২৮। মাসআলা ঃ যে জিনিস শরীর হইতে বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যায়, সে জিনিস নাপাক, আর যে জিনিস বাহির হইলে ওযূ যায় না, সে জিনিস নাপাক নহে। অতএব, যদি সামান্য এক

বিন্দু রক্ত বাহির হইয়া থাকে আর যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া না যায়, বা সামান্য কিছু বমি হইয়া থাকে আর তাহাতে ভাত, পানি, পিত্ত বা জমাট রক্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে ঐ রক্ত এবং বমি নাপাক নহে। সুতরাং উহা কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে তাহা ধোয়া ওয়াজিব নহে। আর যদি মুখ ভরিয়া বমি হইয়া থাকে বা রক্ত যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, তবে তাহা নাপাক এবং উহা ধোয়া ওয়াজিব। যদি এই পরিমাণে বমি করিয়া গ্লাস, পেয়ালা বা বদনায় মুখ লাগাইয়া কুল্লি করিবার জন্য পানি লইয়া থাকে, তবে ঐ পাত্রগুলিও নাপাক হইয়া যাইবে। অতএব, সতর্ক হওয়া চাই। হাতে করিয়া পানি লইয়া কুল্লি করাই নিরাপদ।—শামী

২৯। মাসআলা ঃ শিশু ছেলে যে দুধ উদ্‌গীরণ করে তাহারও এই হুকুম, যদি মুখ ভরিয়া না আসিয়া থাকে, তবে নাপাক নহে। কিন্তু মুখ ভরিয়া আসিয়া থাকিলে উহা নাপাক।

—দুররে মুখতার

৩০। মাসআলা ঃ ওযূর কথা বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তারপর ওযূ টুটিয়াছে কি না তাহা স্মরণ নাই; তবে শুধু এতটুকু সন্দেহে ওযূ যাইবে না। পূর্বের ওযূই আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। ঐ ওযূ দিয়া নামায পড়িলে নামায হইয়া যাইবে, তবে সন্দেহ স্থলে পুনরায় ওযূ করাই ভাল।

—দুররে মুখতার

৩১। মাসআলা ঃ ওযূর সময় সন্দেহ হইল যে, অমুক জায়গা ধোয়া হইল কি না এমতাবস্থায় ঐ জায়গা ধুইয়া লইবে। ওযূর শেষে এইরূপ সন্দেহ হইলে কোন পরওয়া করিতে নাই। কিন্তু অমুক জায়গা ধোয়া হয় নাই বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস হইলে সেই জায়গা ধুইয়া লইবে। —শামী

৩২। মাসআলা ঃ বে-ওযূতে কোরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি পৃথক কোন কাপড় দিয়া ধরে তবে জায়েয আছে। কিন্তু নিজের পরিহিত কাপড় বা কোর্তার আঁচল দিয়া ধরা জায়েয নহে। যদি মুখস্থ পড়ে, তবে বে-ওযূতেও জায়েয আছে, আর যদি কোরআন শরীফ সামনে খোলা থাকে, উহাতে হাত না লাগায়, তবে দেখিয়া পড়াও জায়েয আছে। এইরূপে যে সব তা'বীযে বা তশ্‌তরিতে কোরআন শরীফের আয়াত লেখা থাকে তাহাও বে-ওযূতে ছোঁয়া জায়েয নহে। এই মাসআলা খুব ভালভাবে মনে রাখিবে। —দুররে মুখতার

মা'যূরের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ যাহার নাক বা অন্য কোন যখম হইতে অনবরত রক্ত বহিতে থাকে বা অনর্গল পেশাবের ফোঁটা আসিতে থাকে, এমন কি নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও বিরাম হয় না যাহাতে শুধু ফরয অঙ্গগুলি ধুইয়া ওযূর সহিত সংক্ষেপে ফরয নামায আদায় করিয়া লইতে পারে, এইরূপ ব্যক্তিকে মা'যূর বলে। মা'যূরের হুকুম এই যে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে তাজা ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। যে পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত তাহার ওযূ থাকিবে; (ওযরজনিত রক্ত বা পেশাব বাহির হওয়ার কারণে তাহার ওযূ যাইবে না।) কিন্তু যে রোগের কারণে মা'যূর হইয়াছে, তাহা ছাড়া ওযূ টুটার অন্য কোন কারণ পাওয়া গেলে অবশ্য ওযূ টুটিয়া যাইবে এবং আবার ওযূ করিতে হইবে। যেমন, কাহারও নাক দিয়া অনবরত রক্ত বাহির হইতে থাকে, একেবারেই বন্ধ হয় না, সে যোহরের সময় ওযূ করিল তবে যে পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত ঐ নাকের রক্তের কারণে তাহার ওযূ টুটিবে না; কিন্তু যদি পেশাব-পায়খানা করিয়া থাকে, বা সূঁচ বিদ্ধ হইয়া রক্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে

এবং পুনরায় ওযূ করিতে হইবে। যখন যোহরের ওয়াক্ত অতীত হইয়া আছরের ওয়াক্ত আসিবে, তখন আবার ওযূ করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে তাজা ওযূ করিতে হইবে এবং এই ওযূর দ্বারা ফরয, নফল সব নামায পড়িতে পারিবে। —শরহে তান্‌বীর

২। **মাসআলা ঃ** মা'যূর ব্যক্তি ফজরের সময় ওযূ করিয়াছে সূর্যোদয় হইলে সেই ওযূ দিয়া আর নামায পড়িতে পারিবে না, আবার ওযূ করিতে হইবে। যদি সূর্যোদয়ের পর ওযূ করিয়া থাকে, তবে সে ওযূ দিয়া যোহরের নামায পাড়িতে পারে, নূতন ওযূ করিতে হইবে না। কিন্তু আছরের ওয়াক্ত আসিলে নূতন ওযূ করিতে হইবে। যদি অন্য কোন কারণে ওযূ টুটিয়া থাকে, তবে পৃথক কথা। —শরহে বেদায়া

৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও একটি যখম ছিল তাহা হইতে সব সময় রক্ত বাহির হইত; কিন্তু ওযূ করিবার পর আর একটা যখম হইয়া আরও রক্ত বাহির হইতে লাগিল, তখন তাহার ওযূ টুটিয়া গিয়াছে, আবার ওযূ করিতে হইবে। —শরহে তান্‌বীর

৪। **মাসআলা ঃ** মা'যূরের হুকুম পাইবার জন্য শর্ত এই যে, একটা ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এমনভাবে গুযারিয়া যাইবে, যেন অবিরাম রক্ত বাহির হইতে থাকে, এতটুকু সময়ের জন্যও বন্ধ হয় না যে, শুধু ঐ ওয়াক্তের ফরয নামাযটা ওযূর সহিত পড়িয়া লইতে পারে। যদি সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময় মিলে যে ওযূর সহিত ঐ ওয়াক্তের ফরয নামায পড়িয়া লইতে পারে, তবে আর তাহাকে মা'যূর বলা যাইবে না। মা'যূরের জন্য যে হুকুম আর যে মা'ফ আছে, তাহাও সে পাইবে না; কিন্তু এক ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এরূপভাবে গুযারিয়া গেল যে, পবিত্রতার সহিত নামায পড়ার সুযোগ পায় নাই, তখন সে মা'যূর হইল! এখন তাহাকে প্রত্যেক ওয়াক্তে নূতন ওযূ করিতে হইবে। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াক্ত আসিবে, তখন সম্পূর্ণ ওয়াক্তের রক্ত বাহির হওয়া শর্ত নয়; বরং যদি পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে একবারও রক্ত আসে আর সব সময় ভাল থাকে, তবুও সে মা'যূরেরই হুকুম পাইবে। যদি এক ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এরকম গুযারিয়া যায় যে, রক্ত একবারও বাহির হয় নাই, তখন আর সে মা'যূর থাকিবে না। যতবার রক্ত বাহির হইবে, ততবারই ওযূ টুটিয়া যাইবে। (মাসআলাটা কিছু কঠিন, ভালমতে বুঝিয়া রাখিবে!)

—শরহে তান্‌বীর

৫। **মাসআলা ঃ** যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হইলে পর যদি কাহারও রক্ত বাহির হইতে শুরু হয়, তবে তাহার যোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ, যখন এতটুকু সময় থাকে যে, ফরয ওযূর অঙ্গগুলি ধুইয়া শুধু ফরয চারি রাকা'আত নামায আদায় করিতে পারে, তখন পর্যন্ত) অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে ত ভালই, নতুবা ওযূ করিয়া নামায পড়িয়া লইবে, (কিন্তু মা'যূরের হুকুম পাইবে না।) তারপর আবার আছরের সময়ও যদি সম্পূর্ণ ওয়াক্ত এই রকমভাবেই রক্ত বাহির হইতে থাকে যে, নামায পড়িবার জন্য বিরাম পাওয়া যায় না, তবে এখন আছরের ওয়াক্ত গুযারিয়া যাওয়ার পর তাহার উপর মা'যূরের হুকুম লাগান হইবে। যদি আছরের ওয়াক্ত কিছু থাকিতে রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে, তবে আর সে মা'যূর হইবে না। যে সব নামায এই ওয়াক্তের মধ্যে পড়িয়াছে তাহা দুরুস্ত হয় নাই; সুতরাং দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। (আছরের ওয়াক্তেও মাক্‌রূহ ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে ত ভালই, নতুবা ওযূ করিয়া নামায মাক্‌রূহ্ ওয়াক্তের আগেই পড়িয়া লইবে; কিন্তু (মাক্‌রূহ) ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে ঐ নামায আবার পড়িতে হইবে।) —রঃ মোহ্‌তার

৬। **মাসআলা ঃ** উপরোক্ত নিয়মানুসারে যাহার উপর মা'যূরের হুকুম লাগান হইয়াছে এরকম একজন লোক পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির কারণে ওযূ করিয়াছিল, ওযূ করিবার সময় রক্ত (অর্থাৎ, যে কারণে সে মা'যূরের হুকুম পাইয়াছে তাহা) বন্ধ ছিল, ওযূ শেষ করার পর রক্ত বাহির হইতে শুরু হইয়াছে, এখন এই রক্ত বাহির হওয়ার কারণে তাহার ওযূ টুটিয়া যাইবে ; কিন্তু বিশেষ করিয়া ঐ রক্ত বাহির হওয়ার কারণে যে ওযূ করিবে, সে ওযূ অবশ্য আবার রক্ত বাহির হওয়ার কারণে টুটিবে না। —আলমগীরী

৭। **মাসআলা ঃ** যদি এই রক্ত ইত্যাদি (অর্থাৎ, যাহার কারণে মা'যূরের হুকুম লাগান হইয়াছে তাহা) কাপড়ে লাগে এবং এরূপ মনে হয় যে, নামায শেষ করিবার পূর্বে আবার লাগিয়া যাইবে, তবে ঐ রক্ত ধোয়া ওয়াজিব নয়। আর যদি মনে হয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত লাগিবে না ; পাক কাপড়েই নামায শেষ করিতে পারিবে, তবে ধুইয়া লওয়া ওয়াজিব, রক্ত এক দেরহাম[১] পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইলে উহা না ধুইলে নামায হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

গোছলের বয়ান

১। **মাসআলা ঃ** (গোছল করিবার পূর্বে প্রথম মনে মনে নিয়ত করিবে অর্থাৎ, চিন্তা করিবে যে, "আমি পাক হইবার উদ্দেশ্যে গোছল করিতেছি!") তারপর প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইবে, তারপর এস্তেঞ্জার জায়গা ধুইবে। হাতে এবং এস্তেঞ্জার জায়গায় নাজাছাত থাকুক বা না থাকুক, এই জায়গা প্রথমে ধুইবে। তারপর শরীরের কোথাও নাজাছাত লাগিয়া থাকিলে তাহা ধুইবে, তারপর ওযূ করিবে। যদি কোন চৌকি বা পাথরের উপর গোছল করে (যাহাতে পরে আর পা ধোয়ার দরকার হইবে না,) তবে ওযূ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাও ধুইয়া লইবে, আর যদি এমন জায়গায় গোছল করে যে, পায়ে কাদা লাগিয়া যাইবে এবং পরে আবার ধুইতে হইবে, তবে পূর্ণ অযূ করিবে কিন্তু পা ধুইবে না। তৎপর তিনবার মাথায় পানি ঢালিবে, তারপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালিবে, তারপর তিনবার বাম কাঁধে পানি ঢালিবে। পানি এমনভাবে ঢালিবে যাহাতে সমস্ত শরীর ধুইয়া যায়। তারপর পাক জায়গায় সরিয়া গিয়া পা ধুইয়া লইবে, আর যদি ওযূর সঙ্গে পা ধুইয়া থাকে, তবে আবার ধোয়ার দরকার নাই। —শরহে তান্‌বীর

২। **মাসআলা ঃ** পানি ঢালিবার পূর্বে সমস্ত শরীর ভালমতে ভিজা হাত দ্বারা মুছিয়া দিবে, তারপর পানি ঢালিবে। এইরূপ করিলে সহজে সমস্ত জায়গায় পানি পৌঁছিয়া যাইবে, কোথাও শুকনা থাকিবে না। —মুনইয়া

৩। **মাসআলা ঃ** উপরে গোছলের যে নিয়ম বলা হইয়াছে ইহাই সুন্নত মোতাবেক গোছল। কিন্তু ইহার মধ্যে কয়েকটি কাজ এমন আছে যাহা না হইলে গোছলই হয় না ; যেমন নাপাক তেমন নাপাকই থাকিবে, সেগুলিকে 'ফরয' বলে। আর কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা করিলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু না করিলে গোছল হইয়া যায়, এইগুলিকে 'সুন্নত' বলে। গোছলের মধ্যে ফরয মাত্র তিনটি ; যথা—(১) এমনভাবে কুল্লি করা যাহাতে সমস্ত মুখে পানি পৌঁছিয়া যায়। (২) নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছান ; (৩) সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছান। —হেদায়া

টিকা

১ হাতের তালুকে সম্পূর্ণ খুলিয়া পানি রাখিলে যে পরিমাণ স্থানে পানি থাকে উহাকে এক 'দেরহাম'-এর পরিমাণ বলে।

৪। **মাসআলা ঃ** গোছলের সময় কেব্‌লার দিকে মুখ করিবে না। পানি বেহুদা খরচ করিবে না, আবার এত কমও খরচ করিবে না যে, গোছলও ভালমতে হয় না। গোছল এমন জায়গায় করিবে যেন অন্য কেহ দেখিতে না পায়। গোছল করিবার সময় কথা বলিবে না। গোছল শেষ হইলে কাপড় দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিয়া (মেয়েলোক) অতি সত্বর শরীর ঢাকিয়া লইবে। এমন কি, যদি গোছলের ওযূ করিবার সময় পা না ধুইয়া থাকে, তবে গোছলের জায়গা হইতে সরিয়া আগে শরীর ঢাকিয়া লইবে পরে উভয় পা ধুইবে। —মারাকী

৫। **মাসআলা ঃ** কাহারও দেখিবার সম্ভাবনা নাই এ-রকম জায়গায় উলঙ্গ হইয়া গোছল করাও জায়েয আছে বসিয়া হোক অথবা দাঁড়াইয়া, গোছলখানার ছাদ থাকুক বা না থাকুক; কিন্তু (এরকম দরকার পড়িলে) বসিয়া গোছল করাই বেহ্‌রত (উত্তম)। কেননা, বসিয়া গোছল করাতে পর্দা বেশী হয়; নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত স্ত্রীলোকের জন্যও অপর স্ত্রীলোকের সামনে খোলা জায়েয নহে। সাধারণতঃ মেয়েলোকেরা এদিকে লক্ষ্য রাখে না। তাহারা ভাবে যে, আওরতের সামনে আওরতের আর কি পর্দা, কিন্তু ইহা মস্ত বড় ভুল এবং নির্লজ্জতার কথা। —মারাকী

৬। **মাসআলা ঃ** গোছল করিবার নিয়ত করুক বা না করুক, সমস্ত শরীরে পানি বহিয়া গেলে এবং কুল্লি করিয়া লইলে, আর নাকে পানি দিলে গোছল হইয়া যাইবে। এরূপ শরীর ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে বৃষ্টিতে যদি দাঁড়ায় বা হঠাৎ পুকুর ইত্যাদিতে পড়িয়া যায় আর সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায়, কুল্লিও করিয়া লয় এবং নাকেও পানি দিয়া লয়, তবে গোছল হইয়া যাইবে। গোছল করিবার সময় কলেমা পড়া বা কলেমা পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া লওয়ারও কোন দরকার নাই; কলেমা পড়ুক বা না পড়ুক গোছল হইয়া যাইবে, বরং গোছল করিবার সময় কলেমা বা অন্য কোন দো'আ না পড়াই ভাল। —মুন্‌ইয়া

৭। **মাসআলা ঃ** সমস্ত শরীরের একটা পশম পরিমাণ শুক্‌না থাকিলেও গোছল হইবে না। এইরূপে যদি কুল্লি করিতে বা নাকে পানি দিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবেও গোছল হইবে না। (যেমন নাপাক ছিল তেমনই থাকিবে, নামায ইত্যাদি কিছুই হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৮। **মাসআলা ঃ** গোছল শেষে মনে পড়িল যে, অমুক জায়গাটা শুকনা রহিয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় আবার সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইবার দরকার নাই, শুধু সেই জায়গাটুকু ধুইয়া লইলেই হইবে; কিন্তু শুধু ভিজা হাত ফিরাইয়া দিলে হইবে না, কিছু পানি লইয়া ধুইয়া ফেলিবে। আর যদি কুল্লি করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে এখন শুধু কুল্লি করিবে; আর যদি নাকে পানি দেওয়া ভুলিয়া থাকে, এখন শুধু নাকে পানি দিবে। ফলকথা, যেটুকু বাকী রহিয়াছে শুধু সেইটুকু ধুইলেই চলিবে; সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইতে হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৯। **মাসআলা ঃ** রোগের দরুন মাথায় পানি দিলে যদি ক্ষতি হয়, তবে মাথা ব্যতীত সমস্ত শরীর ধুইয়া লইলেও গোছল হইয়া যাইবে। সুস্থ হওয়ার পর মাথা ধুইলে চলিবে। সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইতে হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১০। **মাসআলা ঃ** গোছলের মাসায়েল দ্রষ্টব্য।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি মেয়েলোকের মাথার চুল বেণী পাকান না হয়, তবে সমস্ত চুল এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান ফরয। যদি একটি চুল বা একটি চুলের গোড়াও শুকনা থাকে, তবে গোছল হইবে না। যদি চুল বেণী পাকান হয়, তবে সমস্ত চুল না ভিজাইলেও চলিবে। অবশ্য চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান ফরয। একটি চুলের গোড়াও শুক্‌না থাকিলে চলিবে না।